নিজ বাসভূমে

শামসুর রাহমান

শামসুর রাহমান

নওরোজ সাহিত্য সংসদ ঢাকা

নসাস প্রকাশিত একটি কাব্যগ্রন্থ
গ্রন্থস্বত্ব : জোহরা রাহমান

[নসাস-৫৫]

প্রকাশনায়
নওরোজ সাহিত্য সংসদ ঢাকা'-র পক্ষে
ইফতেখার রসুল জর্জ
৪৬ বাংলাবাজার
ঢাকা ১

প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭১

প্রচ্ছদ
ডঃ নওয়াজেশ আহমদ
সৈয়দ লুৎফুল হক

মুদ্রণে
ভুঁইয়া গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
১৯২ ফকিরাপুল
ঢাকা ২

আবহমান
বাংলার শহীদদের
উদ্দেশে

নসাস প্রকাশিত কবির আরো একটি
কাব্যগ্রন্থ
দুঃসময়ের মুখোমুখি

সূচীপত্র

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়।
মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়
ঘিরে রয় সর্বদাই। কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে
শিউলীশৈশবে 'পাখী সব করে রব' ব'লে মদনমোহন
তর্কালংকার কী ধীরোদাত্ত স্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক। তুমি আর আমি,
অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর মমতায় লীন,
ঘুরেছি কাননে তাঁর নেচে নেচে, যেখানে কুসুম-কলি সবই
ফোটে, জোটে অলি ঋতুর সংকেতে।

আজন্ম আমার সাথী তুমি,
আমাকে স্বপ্নের সেতু দিয়েছিলে গ'ড়ে পলে পলে,
তাইতো ত্রিলোক আজ সুনন্দ জাহাজ হ'য়ে ভেড়ে
আমারই বন্দরে।

গলিত কাচের মতো জলে ফাৎনা দেখে দেখে রঙিন মাছের
আশায় চিকন ছিপ ধ'রে গেছে বেলা। মনে পড়ে, কাঁচি দিয়ে
নক্সা কাটা কাগজ এবং বোতলের ছিপি ফেলে
সেই কবে আমি 'হাসিখুশি'র খেয়া বেয়ে
পৌঁছে গেছি রত্নদ্বীপে কম্পাস বিহনে।

তুমি আসো, আমার ঘুমের বাগানেও
সে কোন্ বিশাল
গাছের কোটর থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে আসো,
আসো কাঠবিড়ালির রূপে,
ফুল্ল মেঘমালা থেকে চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো ঐরাবত সেজে,
সুদূর পাঠশালার একান্নটি সতত সবুজ
মুখের মতোই দুলে দুলে ওঠো তুমি

বারবার কিম্বা টুকটুকে লঙ্কা-ঠোঁট টিয়ে হ'য়ে
কেমন দুলিয়ে দাও স্বপ্নময়তায় চৈতন্যের দাঁড়।

আমার এ অক্ষিগোলকের মধ্যে তুমি আঁখিতারা।
যুদ্ধের আগুনে,
মারীর তাণ্ডবে,
প্রবল বর্ষায়
কি অনাবৃষ্টিতে,
বারবনিতার
নূপুর নিক্কনে,
বনিতার শান্ত
বাহুর বন্ধনে
ঘৃণায় ধিক্কারে,
নৈরাজের এলো-
ধাবাড়ি চীৎকারে,
সৃষ্টির ফাল্গুনে

হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার ?
উনিশ শো' বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।
সে-ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হ'লে আমার সত্তার দিকে
কতো নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।
এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি,
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষমাস !
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।

ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯

এখানে এসেছি কেন ? এখানে কী কাজ আমাদের ?
এখানে তো বোনাস ভাউচারের খেলা নেই কিম্বা নেই মায়া
কোনো গোল টেবিলের, শাসনতন্ত্রের ভেল্‌কিবাজি.
সিনেমার রঙিন টিকিট
নেই, নেই সার্কাসের নিরীহ অসুস্থ বাঘ, কসরৎ দেখানো
তরুণীর শরীরের ঝলকানি নেই কিম্বা ফানুস ওড়ানো
তা-ও নেই, তবু কেন এখানে জমাই ভিড় আমরা সবাই ?

আমি দূরে পলাশতলীর
হাড্‌ডিসার ক্লান্ত এক ফতুর কৃষক,
মধ্যযুগী বিবর্ণ পটের মতো ধু-ধু,
আমি মেঘনার মাঝি, ঝড় বাদলের
নিত্য-সহচর,
আমি চটকলের শ্রমিক,
আমি মৃত রমাকান্ত কামারের নয়ন পুত্তলি,
আমি মাটিলেপা উঠোনের
উদাস কুমোর, প্রায় ক্ষ্যাপা, গ্রাম উজাড়ের সাক্ষী,
আমি তাঁতী সংগীহীন, কখনো পড়িনি ফার্সি, বুনেছি কাপড় মোটা-মিহি
মিশিয়ে মৈত্রীর ধ্যান তাঁতে.
আমি
রাজস্ব দফতরের করুণ কেরাণী, মাছি-মারা তাড়া-খাওয়া,
আমি ছাত্র, উজ্জ্বল তরুণ,
আমি নব্য কালের লেখক,
আমার হৃদয়ে চর্যাপদের হরিণী
নিত্য করে আসা-যাওয়া, আমার মননে
রাবীন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিন্যাসে
এবং মেলাই তাকে বাস্তবের তুমুল রোদ্দুরে
আর চৈতন্যের নীলে কতো স্বপ্ন-হাঁস ভাসে নাক্ষত্রিক স্পন্দনে সর্বদা।

আমরা সবাই
এখানে এসেছি কেন ? এখানে কী কাজ আমাদের ?
কোন্ সে জোয়ার
করেছে নিক্ষেপ আমাদের এখন এখানে এই
ফাল্গুনের রোদে ? বুঝি জীবনেরই ডাকে
বাহিরকে আমরা করেছি ঘর, ঘরকে বাহির।

জীবন মানেই
মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো,
জীবন মানেই
ফসলের গুচ্ছ বুকে নিবিড় জড়ানো,
জীবন মানেই
মেঘনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দাঁড় বাওয়া পাল খাটানো হাওয়ায়,
জীবন মানেই
পৌষের শীতার্ত রাতে আগুন পোহানো নিরিবিলি।
জীবন মানেই
মুখ থেকে কারখানার কালি মুছে বাড়ি ফেরা একা শিস দিয়ে,
জীবন মানেই
টেপির মায়ের জন্যে হাট থেকে ডুরে শাড়ি কেনা,
জীবন মানেই
বইয়ের পাতায় মগ্ন হওয়া, সহপাঠিনীর চুলে
অন্তরঙ্গ আলো তরঙ্গের খেলা দেখা,
জীবন মানেই
তালে তালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিলে চলা, নিশান ওড়ানো,
অন্যায়ের প্রতিবাদে শূন্যে মুঠি তোলা,
জীবন মানেই
মায়ের প্রসন্ন কোলে মাথা রেখে শৈশবের নানা কথা ভাবা,
জীবন মানেই
খুকির নতুন ফ্রকে নক্সা তোলা, চারু লেস্ বোনা,
জীবন মানেই
ভায়ের মুখের হাসি, বোনের নিপুণ চুল আঁচড়ানো,
প্রিয়ার খোঁপায় ফুল গোঁজা ;

জীবন মানেই
হাসপাতালের বেডে শুয়ে একা আরোগ্য ভাবনা,
জীবন মানেই
গলির মোড়ের কলে মুখ দিয়ে চুমুকে চুমুকে জলপান,
জীবন মানেই
রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়ানো,
স্ফুলিঙ্গের মতো সব ইস্তাহার বিলি করা আনাচে কানাচে
জীবন মানেই ... ...

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হ'য়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়—ফুল নয়, ওরা
শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।

এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রঙ,
যে রঙ লাগে না ভালো চোখে, যে-রঙ সন্ত্রাস আনে
প্রাত্যাহিকতায় আমাদের মনে সকাল সন্ধ্যায়—
এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ ঘাট, সারা দেশ
ঘাতকের অশুভ আস্তানা।
আমি আর আমার মতোই বহু লোক
রাত্রিদিন ভূলুন্ঠিত ঘাতকের আস্তনায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ
কেউ বা ভীষণ জেদী, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া। চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কলমবন হচ্ছে তছনছ।

বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের বুক আজ উন্মথিত মেঘনা,
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।

দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই
জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনো বীরের রক্তে দুখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।

পুলিশ রিপোর্ট

এত উজ্জ্বলতা আমি কখনো দেখিনি।
সবখানে জ্বলজ্বলে ঝোপ; এত উজ্জ্বলতা, চোখ-অন্ধ-করা,
চৈতন্য-ধাঁধানো
উজ্জ্বলতা দেখেননি মুসাও কখনো।
হাতে নিয়ে পাকা লাঠি দেখলাম ওরা, সংখ্যাহীন
জ্বলজ্বলে ঝোপঝাড় এগোয় কেবলি। চতুর্দিকে তরঙ্গিত মাথা,
উত্তাল, উদ্দাম।

সড়কের দুকূল-ছাপানো
লোক, শুধু লোক।
লোক,
আমাদের চোখের পাতায়
লোক।
লোক,
পাঁজরের প্রতিটি সিঁড়িতে
লোক।
লোক,

ধুকপুকে বুকের স্কোয়ারে
লোক।

হঠাৎ সে কোন্ তরুণের বুকের গভীর থেকে
কী যেন ফিন্‌কি দিয়ে ছোটে, পড়ে আমার দু'হাতে।
রক্ত এত লাল আর এমন গরম
কখনো জানিনি আগে, ব্যারাকে পেঁছেই ঘন ঘন
ধুই হাত ঘ'ষে ঘ'ষে,
অথচ মোছে না দাগ কিছুতেই সে তাজা রক্তের।
হোস পাইপের অজস্রতা পারে না মুছতে দাগ,
এ-দাগ ফেলবে মুছে এত পানি ধরে না সমুদ্রে কোনোদিন।

ঘড়িতে গভীর রাত, ব্যারাক নিশ্চুপ। বারান্দায়
করি পায়চারি আর হঠাৎ কখনো কানে ভেসে আসে
সমুদ্রের বিপুল গর্জন;
সুন্দরবনের সব বাঘ যেন আমার ওপর
পড়বে ঝাঁপিয়ে ক্ষমাহীন।

ঘুমোতে পারি না আমি কিছুতেই, ঘুমকে করেছি গুম খুন।
কেমন উৎকট গন্ধ লেগে রয় সকল সময়
আমার দু'হাতে আর সমস্ত শহরে।
সারাটা শহর যদি কেউ দিত ঢেকে
অজস্র সুগন্ধি ফুলে, তবে দু'টি হাত গোপনে লুকিয়ে
রাখতাম সুরভিত ফুলের কবরে সর্বদাই।

ফিরে যাচ্ছি

ফিরে যাচ্ছি, ফিরে যাচ্ছি, আমি যেন সুপ্রাচীন গ্রীক,
নীল ত্রিপলের মতো আকাশের নিচে এ্যাম্ফিথিয়েটার

থেকে ফিরে যাচ্ছি পালা দেখে,
ফিরে যাচ্ছি আলো থেকে অন্ধকারে।
কে যেন ডাকছে শুনি; এ আমার মতিভ্রম, কেউ ডাকছে না,
কেউ ডাকবে না।

এখনো তো চোখে
ভাসে অর্ধপশু অর্ধ মানবের ক্ষিপ্র পেশী আর কানে আসে
প্রবীণ পুরোহিতের নিবিড় প্রার্থনা।
নগরের পুরুষের কোলাহল আর পুরনারীর বিলাপে
ছায়াচ্ছন্ন পথ-ঘাট, প্রতি চত্বর। নতজানু
কে যেন প্রগাঢ় স্বরে বলে, "হে রাজন,
আমাদের নগরের পরিত্রাণ চাই।"

ওরা তো সদলবলে আসে, জড়ো হয় হাটে-মাঠে,
বস্তি-বন্দরের
আলো আঁধারিতে,
কখনো জলার ধারে কিম্বা গাছতলায় কখনো।
ওরা আসে বেয়াড়া দামাল,
দ্যাখে শ্রেণীস্বার্থের সাধের গণ্ডি ছুঁয়ে
চকিতে কোথায় যেন সোনার হরিণ ছুটে যায়,
চতুর্দিকে মৃত্যুর সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে
দেখেও কেবলি ওরা—যে যাই বলুক—
সোনার হরিণ চায়। আপাতত নৈরাজ্যের সাথে
মিতালী পাতাতে গররাজি।
ওরা তো সদলবলে আসে, ওরা আসে,
পায়ে ইতিহাসের কর্দম; কী বিশ্বাসে
পথ চলে অবিরাম, দিগন্তে নিবদ্ধ দৃষ্টি, অথচ জানে না
পদে পদে প্রমাদেরই ফাঁদ।
কখনো-বা লাঠি ঘোরে, কখনো নিশান ওড়ে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বাজারে ফুলুরি নিয়ে দরাদরি, জিলিপীর রসে
বড় সিক্ত, আহ্লাদিত ছেলে বুড়ো যুবকের কষ।

পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ইত্যাদি চলছে
পুরোদমে ইতস্ততঃ। প্রতিহারী হেঁকে যায় সুউচ্চ প্রাচীরে
পরিখায় পরিখায় জনশূন্যতায়।
দু'টো চোখ উপড়ে নিলেও, হে রাজন,
প্রাক্তন পাপের বোঝা কমবে না একতিলও। কাঁদো
দারুণ রক্তাক্ত চোখে কাঁদো
প্রাকারে দাঁড়িয়ে একা। হবে না প্রতিধ্বনিত তোমার দরবার
সুললিত স্তবে।
পঞ্চমাঙ্ক শেষ, ফিরে যাচ্ছি............
চৌদিকে শবের ছড়াছড়ি, ফিরে যাচ্ছি............
ভাঁড়ের কেবলি ভয়, কখন মাড়িয়ে দেয় নায়কের শব,
ফিরে যাচ্ছি--
বিকৃত শবের গন্ধ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি বিবরে আবার
এ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে পালা দেখে ফিরে যাচ্ছি আর
জানেন তো বস্তুত পালাটা বিয়োগান্ত ফিরে যাচ্ছি।

মা সন্ধ্যায় বাতি জ্বালেননি ব'লে,
পিতা দরজার কাছে এসে
উদার অভিজ্ঞ হাত বাড়াননি ব'লে,
ভাই তার নিপুণ সেতার বাজায়নি ব'লে
বোন ঘর সাজায়নি ব'লে
ফিরে যাচ্ছি, ফিরে যাচ্ছি, কেউ ডাকছে না।
কেউ ডাকবে না ?

হরতাল

(শহীদ কাদরীকে)

প্রতিটি দরজা কাউন্টার কনুইবিহীন আজ। পা মাড়ানো,
লাইনে দাঁড়ানো নেই, ঠেলাঠেলিহীন ;
মুদ্রার রুপোলি পরী নয় নৃত্যপরা শিকের আড়ালে

অথবা নোটের তাড়া গাংচিলের চাঞ্চল্যে অধীর
ছোঁয় না দেরাজ। পথঘাটে
ভাল ভাল মাংসের উষ্ণতা
সমাধিস্থ কর্পূরে বেবাক।
মায়ের স্তনের নিচে ঘুমন্ত শিশুর মতো এ শহর অথবা রুঁদার
ভাবুকের মতো ;
দশটি বাঙময় পংক্তি রচনার পর একাদশ পংক্তি নির্মাণের আগে
কবির মানসে জমে যে-স্তব্ধতা, অন্ধ, ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্র
থাবা থেকে গা বাঁচিয়ে বুকে
আয়াতের নক্ষত্র জ্বালিয়ে
পাথুরে কন্টকাবৃত পথ বেয়ে ঊর্ণাজাল-ছাওয়া
লুকানো গুহার দিকে যাত্রাকালে মোহাম্মদ যে-স্তব্ধতা আস্তিতের ভাঁজে
একদা নিয়েছিলেন ভ'রে,
সে স্তব্ধতা বুঝি
নেমেছে এখানে।

রাজপথ নিদাঘের বেশ্যালয়, স্তব্ধতা সঙিন হ'য়ে বুকে
গেঁথে যায় ; একটি কি দুটি
লোক ইতস্ততঃ
প্রফুল্ল বাতাসে ওড়া কাগজের মতো ভাসমান।

সবখানে গ্যাসোলিন পাইপ বিশুষ্ক, মানে ভীষণ অলস,
হঠাৎ চমক লাগে মধ্যপথে নিজেরই নিঃশ্বাস শুনে আর
কোথাও অদূরে
ফুল পাপড়ি মেলে পরিস্ফুট শব্দ শুনি ;
এঞ্জিনের গহন আড়াল থেকে বহুদিন পর
বহুদিন পর
অজস্র পাখির ডাক ছাড়া পেলো যেন।
সুকন্ঠ নিবিড় পাখি আজো
এ শহরে আছে কখনো জানিনি আগে।

ট্যুরিস্ট দু'চোখ
বেড়ায় সবুজে ঃ
সমাহিত মাঠে
ছেলেদের ছায়ারা খেলছে এক গভীর ছায়ায়।
কলকারখানায়
তেজী ঘোড়াগুলো
পাথুরে ভীষণ ;
ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জানালা থেকে সরু
পাইপের মতো গলা বাড়িয়ে সারস এক স্তব্ধতাকে খায়।

শহর ঢাকার পথ ফাঁকা পেয়ে কতো কী-যে বানালাম হেঁটে-যেতে যেতে
বানালাম ইচ্ছেমতো ঃ আঙুলের ডগায় হঠাৎ
একটি সোনালি মাছ উঠলো লাফিয়ে,
বড় হ'তে হ'তে
গেল উড়ে দূরে
কোমল উদ্যানে
ভিন্ন অবয়ব
খুঁজে নিতে অজস্র ফুলের বুদোয়ারে।

হেঁটে যেতে যেতে
বিজ্ঞাপন এবং সাইবোর্ডগুলো মুছে ফেলে
সেখানে আমার প্রিয় কবিতাবলীর
উজ্জ্বল লাইন বসালাম ;
প্রতিটি পথের মোড়ে পিকাসো মাতিস আর ক্যান্ডিনিস্কি দিলাম ঝুলিয়ে।
চৌরাস্তার চওড়া কপাল,
এভেন্যুর গলি, ঘোলাটে গলির কটি,
হরবোলা বাজারের গলা
পাষাণপুরীর রাজকন্যাটির মতো
নিরুপম সৌন্দর্যে নিথর।

স্তূপীকৃত জঞ্জালে নিষ্ক্রিয় রোদ বিড়ালছানা মৃদু
থাবা দিয়ে কাড়ে
রোদের আদর।
জীবিকা বেবাক ভুলে কাচা প্রহরেই
ঘুমায় গাছতলায়, ঠেলাগাড়ির ছায়ায় কিম্বা
উদাস আড়তে,
ট্রলির ওপরে
নিস্তরঙ্গ বাসের গহ্বরে,
নৈঃশব্দের মসৃণ জাজিমে।
বস্তুতঃ এখন
কেমন সবুজ হ'য়ে ডুবে আছে ক্রিয়াপদগুলি
গভীর জলের নিচে কাছিমের মতো শৈবালের সাজঘরে।

চকিতে বদলে গেছে আজ,
আপাদমস্তক
ভীষণ বদলে গেছে শহর আমার!

আমরা প্রার্থী তারই

তোমার আমার কাঙ্ক্ষিত ভোর
আসার আগেই স্বপ্ন-বিভোর
তোমাকে হানলো ওরা।

একদা তুমিও চৈত্র দুপুরে
টলটলে সেই পুরোনো পুকুরে
ফেলেছো চিকন ছিপ।

আম্রছায়ায় কালো দিঘিটায়
এক হাটু জলে দাঁড়িয়েছো ঠায়
শাপলা তুলবে ব'লে।

সর্ষে ক্ষেতের হলদে হাওয়ায়
কী জানি সে কোন্ গভীর চাওয়ায়
হাত দু'টি দিতে মিলে।

ঝোপের কিনারে কখনো হঠাৎ
গুল্তিটা ফেলে বাড়িয়েছো হাত
প্রজাপতিটার দিকে।

সেই কবে তুমি শিরীষের মূলে
আহত পাখিকে নিয়েছিলে তুলে
উদার ব্যগ্র বুকে।

যে-সাড়া তরুণ ঘাসের ডগায়
জ্যোৎস্না-ডোবানো স্বপ্ন জোগায়
তা-ও পেয়েছিলে তুমি।

বলেছিলে তুমি, যে-কথা কখনো
বাজে না হৃদয়ে গান হ'য়ে কোনো
সে-কথা ব্যর্থ, ম্লান।

বলেছিলে আরো, যে-জীবন কারো
প্রাণকে করে না আলোয় প্রগাঢ়,
সে-জীবন নিষ্ফল।

বুঝি তাই প্রেমে বড়ো উৎসুক
তুলে ধরেছিলে স্বদেশের মুখ
নিবিড় অঞ্জলিতে !

খোলা রাস্তায় মিছিলে মিছিলে
চকিতে প্রহরে ছড়িয়ে কী দিলে ?
চৌদিক থরথর।

তোমার আমার কাঙ্খিত ভোর
আসার আগেই স্বপ্ন-বিভোর
তোমাকে হানলো ওরা।

এই আলো আরো পবিত্র হবে
তোমার রক্ত-রাঙা বৈভবে,—
বললো ব্যাকুল পাখি।

যে-আলো তোমার চোখে নেচেছিলো,
যে-আলো তোমার বুকে বেঁচেছিলো
আমরা প্রার্থী তারই।

আসাদের শার্ট

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিম্বা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়।

বোন তার ভায়ের অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায় ;
বর্ষীয়সী জননী সে-শার্ট
উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে কতদিন স্নেহের বিন্যাসে।

ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি-চূড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচে কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।

আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখন্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।

ঐকান্তিক শ্রেণীহীনা

এ রৌদ্রে কেমন ক'রে দাঁড়াও অটল? দেখলাম, অতীতের
মুখের উপর ঝাঁপ বন্ধ ক'রে কেমন সহজে
এলে তুমি সাম্প্রতিক সদর রাস্তায়।
বেণী-নামা পিঠে জমে ঘামের শিশির,
আঁচলে প্রবল হাওয়া, উচ্ছ্বসিত হৃদের মতন
তোমার রুপালি স্বরে করে ঝলমল নানা মনীষীর পাতা।
সামান্যে শিল্পিত বেশ, চলায় বলায় সর্বক্ষণ
রুচির মোহন ছোঁওয়া। কখনো চকিতে মঞ্চে ওঠো জ্বলজ্বলে
পদক্ষেপে, শিরদাঁড়া ঋজু, থরো থরো
ফ্ল্যাগ ব'য়ে নিয়ে যাও পল্টনের মাঠে, কখনো-বা
এভেন্যুর মোড়ে। কলেজের
সংস্কৃত প্রাঙ্গণ, বস্তি, পথঘাট অলংকৃত তোমারই ছায়ায়।

সামাজিক বিকারের কুকুরগুলোকে কোন্ রাঙা
মাংস দিয়ে রাখো শান্ত ক'রে?

কী ক'রে প্রখর দীপ জ্বালছো মশালে,
এ বিস্ময় ঠোকরায় এখনো আমাকে।

দেখছি তোমাকে আমি বহুদিন থেকে, দেখছি এখনো তুমি
বিকেলের বারান্দায় ব'সে
প্রবীণা মায়ের চুলে চালাও চিরুণী স্মৃতি জাগৃতির লগ্নে
পুরানো গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে, কখনো-বা
ভায়ের শার্টের গর্ত ভ'রে তোলো শৈল্পিক নিষ্ঠায়,
কখনো পিতার সঙ্গে তর্কে মাতো এ যুগের মতি গতি নিয়ে,
কখনো তুমুল ভাসো গণউত্থানের গমগমে তরঙ্গ মালায়।

ব্যক্তিগত প্রেম আছে তোমারও গহনে
যে-প্রেম তোমাকে নিয়ে যায় তীব্র আকর্ষণে বহু জীবনের
কল্লোলিত মোহানায়। বুঝি তাই ঊর্মিল আবেগে
ছুটে যাও ভাসমান গ্রামে কি শহরে। ভদ্রয়ানা
আড়ালে রেখেই হও এককাট্টা শোকের শরিক।
কখনো রিলিফ ক্যাম্পে ভাবো চুপচাপ, উন্নয়ন
সুনীল কাগজে আসে আলাদা আদলে। কখনো-বা
নিজের গভীরে দাও ডুব, ভাবো ব'সে তারই কথা,
যে আনে প্রাণের টানে স্বপ্নের উদ্দাম
ভাগীরথী কারখানায় এবং খামারে।

শুধুই আবেগ নয় বুদ্ধির শাণিত রৌদ্র করে ঝলমল
অস্তিত্বে তোমার আর প্রচুর গ্রন্থের পাকা রঙ
লাগে মনে, মননে সমৃদ্ধ তুমি ঐকান্তিক শ্রেণীহীনা;
সর্বোপরি বাস্তবের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে
পেয়েছো বাঁচার সূত্র কর্ম আর ধ্যানে।

প্রথার কৃপণ মাপে সুন্দরী যে-জন
তুমি সে কখনো নও, অথচ তোমারও
নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, যে সৌন্দর্য ঝড়ের ঝাপটায়
সুতন্বী গাছের সাহসের,
যে সৌন্দর্য মানবিক বোধের, প্রেমের, জীবনের।

বিকল্প ঘর

'কেটে পড়ো, কেটে পড়ো মঞ্চ থেকে,' সেই জমজমাট প্রহরে,
ঝলমলে হলঘরে তীক্ষ্ন সমস্বরে
শ্রোতারা জানান দাবী। ভাবি, তবে কী করি এখন উলুবনে ?
এখুনি পড়বো কেটে সিটি আর বেড়ালের ডাক শুনে ? না কি শান্ত মনে
যাবো ব'লে অকম্পিত কন্ঠস্বরে যা' আছে বলার একে একে।
শব্দেরা কাগজ থেকে রঙিন পাখির মতো যায় উড়ে, শ্রোতারা থাকেন বেঁকে।

দিয়েছি বিকল্প ঘর, যেখানে বিপুল স্তব্ধতার
স্তন্য পান ক'রে শব্দে বেড়ে ওঠে লীলায়িত স্বাস্থ্যে,
যেখানে দেখাতে পারি কাঁটা-ঝোপ, লতা-পাতা ফুলের বাহার
এবং দেখাতে পারি ল্যাম্পপোস্টে খুব আস্তে আস্তে
খাচ্ছে দোল দেবদূত, এ্যাসেম্বলী হলের মসৃণ ছাদ থেকে
মনোরম বুররাখ যাচ্ছে উড়ে দুলিয়ে যুগল
পাখা এরোড্রাম ছুঁয়ে, খুরে নক্ষত্রের রেণু মেখে

সে ঘরের চতুষ্কোণ দৃশ্যতই সুদূর মুঘল
কক্ষ হ'য়ে যায় হ'য়ে যায়, এমন কি পাতালের
জল-ধোয়া অমল প্রাসাদ কিম্বা ক্যান্ডিনস্কি দৃশ্য—
বিমূর্ত শীতল বর্ণে লুকোনো ঘরের ছাদ আর চাতালের
শূন্যতা অথবা প্রাণী, গাছপালা। বস্তুত সীমানাহীন সে-ঘরের বিশ্ব।

'কেটে পড়ো' কেটে পড়ো মঞ্চ থেকে। যা'বলছো তার ল্যাজা-মুড়ো
বুঝি না কিছুই'—একজন বললেন হেঁকে নাড়িয়ে শিঙের দুটো চূড়ো,
সঙিনের মতো হাত সিলিং-এর দিকে ভীষণ উঁচিয়ে।
'ওসব শোনার ধৈর্য আমাদের নেই। কেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে
মিছে হয়রান করো আমাদের ? ফূর্তির ফানুস চাই, চপচপে
কথা আর গান চাই। তোমার ওসব ছাইপাশ জ'পে জ'পে

ক্ষেতে বাড়বে না শস্য', ব'লে তাঁরা চকিতে দিলেন ছুঁড়ে কিছু
নষ্ট ডিম, তুলতুলে টমাটো এবং আমি মাথা ক'রে নীচু
মঞ্চে কোণঠাসা হ'য়ে ভাবি সে আগন্তুকের কথা, দৃষ্টি যার
প্রত্যূষের মতো আর শ্রুতি প্রতীক পরম সূক্ষ্মতার।

অথচ আজো সে অবয়বহীন, মধু যামিনীতে
অথবা অমাবস্যায় আসে না শব্দের স্বাদ নিতে।
তবু তাকে লক্ষ্য ক'রে শ্বেত কাগজের শব্দমালা দুলে ওঠে
এবং সবেগে ধায়, যেমন বরফজমা তরঙ্গিনী ছোটে
অকস্মাৎ সূর্যের উদার বুকে লীন হ'তে। আসে যদি, আগন্তুকটিকে
বসিয়ে বিকল্প ঘরে আমি যাবো হরিদ্রাভ বয়সের দিকে।

গ্রন্থে আছেন শহীদুল্লা

গ্রন্থাবলী প'ড়ে আছে, লেখার টেবিলে চশমা, কালো টুপিটায়
জমছে মসৃণ ধুলো এবং জায়নামাজ, পুণ্য স্মৃতিময়,
নিবিড় গোটানো একপাশে। প্রাতরাশ ঠান্ডা হচ্ছে ব'লে কেউ
ডাকবে না ঘন ঘন। প্রত্যহ বাড়বে বেলা, মধ্যরাতে একে একে বাতি
নিভবে প্রতিটি ঘরে। কদিমী চেয়ার ছেড়ে গ্রন্থাগার থেকে
বেরিয়ে আপনি আর সিঁড়ি বেয়ে যাবেন না একা
দোতালায়, মগজের নন্দিত নিকুঞ্জ
আধ্যাত্মিক পাখির অমর্ত্য গানে গুঞ্জরিত হবে না কখনো।

দুশ্চরিত্র সময়ের কাছে আপনাকে নতজানু হতে কেউ
দ্যাখেনি কখনো, আপনার আচকান পেয়েছে সক্ষম পাখা
নিষ্কলুষ নীলিমায়। হে বিদ্যা, হে প্রজ্ঞা, মনীষার মন্বন্তরে
ছিলেন বিপুল অন্নসত্র, যে যেমন খুশি নিয়েছে অঞ্জলি
পেতে বারবার।
এখন আছেন গ্রন্থে, বাংলার স্মৃতিতে, জ্বলজ্বলে দরোজায়।

সেই কবেকার অপরূপ শৈশবকে কোন জাদুবলে চির
প্রতিবেশী করে রেখেছিলেন মায়াবী কুঠুরিতে,
ভেবেছি বিস্ময়ে কতদিন। অন্বেষণে
আলোকিত শতঝুরি একটি বৃক্ষের কাছে চেয়েছেন পৌঁছুতে সর্বদা।

সোনালি মাছের মতো উঠতো লাফিয়ে
আপনার প্রবীণ চোখের নিচে নিত্য অভিধানের শব্দেরা
বারবার, সস্নেহে দিতেন ঠাঁই একান্ত মানস
সরোবরে। পাণিনীয় সূত্রের মায়ায় হেঁটেছেন গহন জটিল পথে
দীর্ঘকাল প্রশ্নাতুর। বাংলা ব্যাকরণ রাজনর্তকীর মতো
মদির কটাক্ষ মেলে আপনাকে ডেকে নিয়ে গেছে
অন্তঃপুরে, সহবাসে বিনোদের ধ্বনি অতঃপর
সামাজিকতায় বেজে ওঠে ঘরে ঘরে।

অন্ধকারে যাবো না কখনো, অন্ধকার
আমাকে ভীষণ ক্রুদ্ধ করে, করতেন উচ্চারণ মনে মনে
হয়তোবা; আপনাকে আলোর প্রেমিক
জেনেছি সর্বদা। অন্ধকারে যাবেন না, যাবেন না কোনোদিন
আমরাও বলেছি ব্যাকুল
অথচ পেছনে সীমাহীন অন্ধকার ফেলে, শুধু
কতিপয় গ্রন্থ হ'য়ে উদাস গেলেন চ'লে অন্য অন্ধকারে।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি

একদা কবিতা তার বুক নগ্ন করেছিলো আপনার চোখের সম্মুখে,
আপনি সে নগ্নতায় দেখেছেন নিজেরই মনের সূর্যোদয়।
একদা কবিতা তার স্তনের গোলাপ কুঁড়ি চেয়েছিলো দিতে,
আপনি সে গোলাপের উজ্জ্বলতা ছেড়ে
কালবোশেখীর ঝড়ে চকিতে গেলেন ছুটে বাগ্মিতা নামের

দজ্জাল মেয়ের কাছে, যার ক্ষিপ্ত তুমুল নর্তনে স্বপ্নগুলি
পড়লো ছড়িয়ে ভাঙা ঘুঙুরের মতো।

কতদিন হার্মোনিয়ামের রীডে নিপুণ আঙুল
তন্ময় নাচেনি আর কতদিন কমিনীর ঠোঁটে
আঁকেন নি প্রগাঢ় চুম্বন।
এখন আপনি সেই যাত্রী আত্মভোলা, হঠাৎ যে নেমে পড়ে
ভুল ইস্টিশানে অবেলায়।
তবু আপনার মতো কারুকেই চাই, চাই আজো নজরুল ইসলাম।

সুপ্রভার তরঙ্গিত সুরের মতোই
হাওয়া ছুঁয়ে যায়
অস্তিত্বের তট,
এবং পবিত্র পাংগুলীর দুটি অক্ষিগোলকের প্রসন্ন রশ্মির মতো
দিবালোক আসে,
প্রমীলার হাসির মতোই জ্যোৎস্না ঝরে আপনার
বুকের নির্জন মরু এবং পায়ের অন্তঃরীপে।
তবুও বুকের মধ্যে কথা
নৈঃশব্দ্যের গভীর মোড়ক ছেঁড়া কথা
হয় না এখন উচ্ছ্বসিত।
আপনার মগজের কোষে কোষে মৃত প্রতিধ্বনি কবিতার ?

কোন পুলিনের খুব স্মৃতিময় বকুল গাছকে
অনেক পেছনে ফেলে ছায়াচ্ছন্ন বারান্দায় শুধায় ফেরারী বুলবুল
কেমন আছেন নজরুল ইসলাম ?
কাবেরী নদীর জল, পদ্মার উত্তাল ঢেউ প্রশ্ন করে আজো ঃ
কেমন আছেন নজরুল ইসলাম ?
বাদুড় বাগান লেন এবং মন্মথ দত্ত রোড
বেলগাছিয়ার

প্রতিটি সকাল আর প্রতিটি সন্ধ্যায় করে প্রশ্ন ঃ
কেমন আছেন নজরুল ইসলাম ?
সারা বাংলাদেশের ব্যাকুল কন্ঠে সেই একই প্রশ্ন
কেমন আছেন নজরুল ইসলাম ?

কবিয়াল রমেশ শীল

কিন্নর কন্ঠের খ্যাতি ছিল না তোমার, কোনোদিন
জলকিন্নরীর ধ্যানে, ঈশ্বরের বিফল সন্ধানে
কাটেনি তোমার বেলা। কুলীন ড্রইংরুমে কিম্বা ফিটফাট রেস্তোরাঁয়
হওনি কখনো তর্কপরায়ণ সাহিত্যের সৌখিন আড্ডায়।
ছিল না তোমার মন জমকালো শিল্পের মহলে, আলোকিত
প্রভাতবেলায় তুমি যে-শিল্পের পেয়েছিলে দেখা
ভীষণ তামাটে তার গ্রীবা রৌদ্রের সুতীব্র আঁচে।

স্বদেশকে প্রিয়ার একান্ত নাম ধ'রে ডেকে ডেকে
অগ্নিবলয়ের মধ্যে গড়েছিলে প্রেমের প্রতিমা
নিজে পুড়ে পুড়ে।
তোমার প্রেমার্ত স্বর পঞ্চান্ন হাজার
একশো ছাব্বিশ বর্গমাইলের আনাচে কানাচে
পেঁছে গেছে। বাউলের গেরুয়া বস্ত্রের মতো মাটি,মাঠআর আকাশের কাছে
নদীর বাঁকের কাছে, মজুরের ক্ষিপ্র, পেশী অত্যাচারী শাসক-দুপুরে
কৃষকের হাল-ধরা মুঠোর কাছেই তুমি শিখেছিলে ভাষা।

বস্তুত এখানো কত বেশী আমরা সবাই যাত্রা ভালবাসি,
এমন কি নিজেরাই 'অধিকারী পার্ট দাও' ব'লে
সমস্বরে ভীষণ চেঁচাই,
সহাস্য বাড়াই মুখ রঙচঙে মুখোশ পরার লোভে আর নিজেদের
কাপ্তান কাপ্তান লাগে কিনা দেখে নিই আড়চোখে

বিকৃত আয়নায়, ঘাড়ে মুখে আলতো বুলিয়ে নিয়ে পাউডার
পরস্পর খুব করি খুনসুটি। ইদানীং আমরা সবাই
অন্ধ মূক আর বধিরের পার্ট ভালবাসি। অথচ তোমার
ভূমিকা সর্বদা ছিল ভিন্নতর। অন্ধকারে থেকে, মনে পড়ে,
দেখতাম রুদ্ধবাক প্রধান যাত্রার তুমি রাজপুত্র, নিঃশঙ্ক, সুকান্ত,
সোনার কাঠির স্পর্শে নিদ্রিতা সত্যকে
অক্লেশে জাগাতে চাও, অভিশপ্ত রাজ্যের উদ্ধারে
কোষমুক্ত করো তরবারি। তুমি পাষাণপুরীর
প্রতিটি মূর্তির স্তব্ধতায় চেয়েছিলে ছিটোতে রুপালি জল।

চোখ বুজলেই দেখি,হু-হু মাঠে,কুটিরে, খোলার ঘরে,দুঃখ-ছাওয়া শেডে,
সুস্থির দাঁড়িয়ে আছো সুদিনের কর্মিষ্ঠ নকীব।

ইচ্ছা

যদি বাঁচি চার দশকের বেশী
লিখবো।
যদি বাঁচি দুই দশকের কম
লিখবো।
যদি বেঁচে যাই একটি দশক
লিখবো।
যদি বেঁচে যাই দু'চার বছর
লিখবো।
যদি বেঁচে যাই একটি বছর
লিখবো।
যদি বেঁচে যাই একমাস কাল
লিখবো।
যদি বেঁচে যাই একদিন আরো
লিখবো।

কী যুগে আমরা করি বাস

কী যুগে আমরা করি বাস। প্রাণ খুলে কথা বলা
মহা পাপ; যদি চেয়ার টেবিল কিম্বা দরজার কানে গলা
খাটো ক'রে বলি কোনো কথা, তবে তারাও হঠাৎ
যেন ব'নে যাবে বড়ো ঝানু গুপ্তচর। এমনকি গাছপালা,
টিলা, নদীনালা
কারুকে বিশ্বাস নেই বাস্তবিক। আমাদের এমনই বরাত।

কী যুগে করি আমরা বাস। এখন প্রতিটি ঘরে
মিথ্যা দিব্যি পা তুলে রয়েছে ব'সে; প্রহরে প্রহরে
পালটাচ্ছে জামা জুতো। সারাক্ষণ খাটছে হুকুম
তারই ক্ষিপ্র ব্যস্ততায় পাড়ার মোড়ল, মজলুম।
মহানুবভতা, প্রীতি ঔদার্য বিবেক সবি নিয়েছে বিদায়
ছেলে-বুড়ো ঘুমোনো পাড়ার থেকে করুণ দ্বিধায়।

কী যুগে আমরা করি বাস। কোনো বসন্তের রাতে
যখন ঘনিষ্ঠ যাই পার্কে দুজনে, অসংখ্য হা-ভাতে
ভিড় ক'রে আসে চারপাশে। আমাদের চুমোর ওপর
পড়ে দুর্ভিক্ষের ছায়া। মহামারী দিগ্বিদিক মাথায় টোপর
প'রে ঘোরে সর্বক্ষণ। আমাদের সন্তানের দোলনা দুলছে মৃদু ছন্দে
অসংখ্য লাশের ঘুম-তাড়ানিয়া উৎকট দুর্গন্ধে।

কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হ'য়ে আছে ?

কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হ'য়ে আছে
এখনো আমার মনে ? দেখেছিতো গাছে
সোনালি বুকের পাখি, পুকুরের জলে

শাদা হাঁস। দেখেছি পার্কের ঝলমলে
রোদ্দুরে শিশুর ছুটোছুটি কিম্বা কোনো
যুগলের ব'সে থাকা আধাঁরে কখনো।

দেশে কি বিদেশে ঢের প্রাকৃতিক শোভা
বুলিয়েছে প্রীত আভা মনে, কখনো-বা
চিত্রকরদের সৃষ্টির সান্নিধ্যে খুব
হয়েছি সমৃদ্ধ আর নিঃসঙ্গতায় ডুব
দিয়ে করি প্রশ্ন ঃ এখনো আমার কাছে
কোন্ দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হ'য়ে আছে ?

যেদিন গেলেন পিতা, দেখলাম মাকে—
জননী আমার নির্দ্বিধায় শান্ত তাঁকে
নিলেন প্রবল টেনে বুকে, রাখলেন
মুখে মুখ; যেন প্রিয় ব'লে ডাকবেন
বাসরের স্বরে। এখনো আমার কাছে
সেই দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হ'য়ে আছে।

তার আগে

কখনো আকাশ কখনো-বা দূরবর্তী গাছপালা,
কখনো গলির মোড়, কোনো আত্মীয়ের মৃত মুখ
ল্যাম্পোস্টের ঝাপসা আলো কুয়াশায়, মর্চে-পড়া তালা
কিম্বা মেথরানীর নিতম্ব কখনো যৎসামান্য ভুলচুক
অথবা সংগীনাকীর্ণ রাত মানসে ঝরায় কতো
কবিতার ফোঁটা। তার আগে ট্রেন চ'লে যায় দ্রুত ছিন্ন ভিন্ন ক'রে
আমার শরীর; চোখে ওঠে লাল পিঁপড়ে অবিরত
ঝাঁক ঝাঁক, হৃৎপিন্ড বিক্ষত হয় পাখির ঠোকরে।

যিনি নম্বর ভালবাসতেন

"নম্বরে জীবন ছাওয়া। সেই কবে ইশকুলের রোল নম্বরের
স্মৃতি নিয়ে বেরিয়েছি পথে,
তারপর থেকে ঝাঁক ঝাঁক
নম্বরের দাবি-দাওয়া মেটাতেই জীবনের প্লেন
ফুরিয়ে ফেলেছে পেট্রোলিয়াম বেবাক। কয়েকটি
পলিসি নম্বর আর বাড়ির নম্বর আর গাড়ির নম্বর,
ব্যাঙ্কের খাতার প্রিয় নম্বর ইত্যাদি
কেবলি করেছি জড়ো, অথচ নম্বর
নিকট এসেছে যতো মানুষ ততই দূরে গেছে চ'লে। তবে
আমি নিজেই কি শুধু কতিপয় নম্বরের সমাহার কোনো ?
শিখেছি অনেক ঠেকে বহু ঘোল খেয়ে
নম্বরের নেই শ্রুতি, নেই আলাপের কোনো সাধ।"
--ব'লে তিনি ব্রিফকেস নেড়ে-চেড়ে বসলেন গার্হস্থ্য মোটরে।

গাড়ি তাঁর হুট ক'রে চলে গেলো, বাড়ির সুরম্য দরজায়
অভ্যস্ত রীতিতে নেমে দেখেন কাগজ কতিপয়
হাওয়ায় উড়ছে আর ক'জন বালক
পাখির ঝাঁকের মতো একরাশ কাগজের পেছনে-পেছনে
ছুটেছে হুল্লোড় ক'রে। মনে হ'লো তাঁর,
কাগজের ঝাঁক যেন এক তাড়া নোট ফুরফুরে
আর তিনি নিজে হৈ-হৈ ছেলেদের সঙ্গে ছুটছেন
উড়ো কাগজের ঠিক পেছনে-পেছনে শৈশবের দিকে ব্যগ্র মুখ রেখে।

"দাড়ি কামানোর পর গালে কিম্বা কোমল চিবুকে
যেসব খুচরো কাটা দাগ লেগে থাকে,
তাদের কেমন যেন অন্তরঙ্গ লাগে, বড়ো ব্যক্তিগত"—ব'লে তিনি
জরুরী ফাইল কিছু রাখলেন গোপন দেরাজে।

চিরচেনা বাগানের দেশী কি বিদেশী ফুল দেখে,
সতেজ ফুলেরা যেন—ভাবলেন তিনি—চকচকে টাকাকড়ি।

হঠাৎ রক্তের চাপ বাড়ে, বুকে ট্যাক্সির ঝাঁকুনি
আপিশের বন্ধ ঘর, ব্রিফকেস, চেক বই, হৈ-হৈ বালকেরা
বাড়ির ঘোরানো সিঁড়ি, লিফট্-এর স্তিমিত আলো, গোপন দেরাজে,
ব্রিফকেস, চেক বই, প্রসন্ন নোটের তাড়া, জরুরী ফাইল,
লিফট্-এর স্তিমিত আলো, হৈ-হৈ বালকেরা, ব্রিফকেস,
পলিসি নম্বর,
গৃহিণীর পলায়নপত্র যৌবনের অস্তরাগ, চেক বই, আপিশের,
বন্ধ ঘর, টাইপিস্ট মেয়েটির লো-কাট ব্লাউজ, বালকেরা,
ব্রিফকেস, অস্তরাগ, লিফট্-এর স্তিমিত আলো, লো-কাট ব্লাউজ,
পলিসি নম্বর,
ব্রিফকেস, চেক বই, প্রসন্ন নোটের তাড়া, চেক বই, চেক বই, চেক...
বাগানের স্তব্ধতায় পতনের শব্দ আর নিঃশব্দ ভীষণ
বুকের একান্ত ঘড়ি, শূন্য হাত, ঘাসে আধপোড়া সিগারেট,
অদূরে নিশ্চুপ ঝারি।
ওপরে অনেক তারা, একান্ত সেকেলে আশরফি।

একটি বালকের জন্যে প্রার্থনা

ভীষণ বুড়িয়ে গেছি ইদানীং আমরা সবাই,
বেশ জবুথবু লাগে নিজেদের বেলা-অবেলায়।

আমরা সবাই বুড়ো। কেউ পঙ্গু বাতে, শয্যা কারো
মালিশের গন্ধে ভরা। পক্ষাঘাতাগ্রস্ত কেউ আর
আদিম গুহার মতো দন্তহীন মুখ খুলে কেউ
বিড় বিড় বকে সারাক্ষণ—বকুনির আগাগোড়া
বাপের আরবী ঘোড়া দাদার ইরানী তাঞ্জামের

ঝিলিমিলি জুড়ে রয়। বারান্দার দাঁড়বন্দী তোতা
সেই বকবকানির ধৈর্যশীল শ্রোতা। তার কী-বা
দায়, ঝুঁটি নাড়ে, ছোলা খুঁটে খায়, বহুবার শোনা
কাহিনীর করে কথকতা। বুকে টুকটুকে ঠোঁট
গুঁজে রাখা, ঘুম পেলে। নিজেদের মতো হ'তে চেয়ে

ক্রমান্বয়ে শুধু অন্য কারুর মতোই হ'য়ে যাই
নিজেরই অলক্ষ্যে; মনে হয়, শখ ক'রে স্টেজে নেমে
নির্ধারিত পার্টের বদলে ভুল পার্ট আওড়াতে
আওড়াতে ক্লান্ত হই। যতই ভুগি না কেন বাতে,
রক্তচাপে, রক্তে রক্তে শর্করার প্রকোপ যতই

যাক বেড়ে, জীবনকে প্রতিদিন মনে হয় তবু
হাড়হিম শীতে সুশোভন পশমের কম্ফর্টার
গলায় জড়ানো, তাই সকালে বিকালে প্রকৃতির
খোলামেলা দরবারে আয়ুর মেয়াদ বাড়ানোর
ব্যাকুল তদ্বির নিয়ে যাই। ভদ্রয়ানা মজ্জাগত
এবং প্রজ্ঞার ভারে দু হাঁটুতে ঠেকে শাদা মাথা,
অথচ চৌদিকে কী-যে ঘটে দিনরাত কিছুতেই
ঢোকে না মাথায়। অভ্যাসের দাস ব'লে প্রতিদিন
সংবাদপত্রের ভাঁজ খুলি আর চোখের অত্যন্ত
কাছে নিয়ে হেড লাইনের মায়ায় বেবাক ভুলি !

লাঠি যেন প্রাণাধিক পুত্র, তাই কম্পমান হাত
কেবলি তাকেই খোঁজে। পাড়ায় হাঙ্গামা বাধলেও
তেমন পাই না টের, আজকাল শ্রুতির প্রাখর্য
বলতে কিছুই নেই। বরং কালাই বলা চলে,
বদ্ধ কালা ! হামেশাই খুব পুরু কাঁচের চশমা
পরি, তবু লোকজন, ঘরবাড়ি, পাড়া কি বেপাড়া,
অলিগলি, গাছপালা স্পষ্ট আর দেখি না কিছুই।

আমরা সবাই বুড়ো, দৃষ্টির স্বচ্ছতা নেই কারো।
আমরা সবাই আজ একটি বালক চাই যার
খোলা চোখে রাজপথে নিমেষেই পড়বে ধরা ঠিক
সেই রাজসিক মিহি কাপড়ের বিখ্যাত ছলনা।

ঋণী

পুরোনো ঢাকার নেড়ী গলি ছেড়ে আজিমপুরের
তেতলার ফ্ল্যাটে যাই বস্তুত আড্ডার লোভে, খানিক হাঁপাই।
ক্লান্তির কফিন ঢাকা শরীর এলিয়ে কৌচে নিঃশব্দে দূরের
আকাশে বুলাই চোখ এবং বৈশাখী গরমেও স্বস্তি পাই
বন্ধুর সুহাস মুখে; উপরন্তু ভাগ্যবলে ফাহ্‌মিদা এখানে অতিথি
আজ রাতে। আমাদের প্রহর সমৃদ্ধ হবে, রাবীন্দ্রিক সুরে
নানান বিন্যাসে অবিরাম দুলবে সত্তার মৌন ঝাউবীথি,
জাগবে আনন্দলোক তেতলার ফ্ল্যাটে সরকারী অজিমপুরে।

ফাহ্‌মিদা সুর ভাঁজে—এ-ও এক বৃষ্টি অপরূপ,
অস্তিত্ব ডুবিয়ে নামে। গীতবিতানের কিছু নিভৃত নিশ্চুপ
পাতা ওড়ে অলৌকিক কলরবে, গাংচিলের মতো ওড়ে, ঘোরে সারা ঘরে
প্রাণের ঊর্মিল জল ছুঁয়ে যায় কতো ছলভরে।
ফাহ্‌মিদা কন্ঠে সুর তুললেই ঘরে রৌদ্র ওঠে, মেঘে মেঘে
বাজে বাঁশি, ভাসে ভেলা, শ্রাবণের ধারা ঝরে, গাছ হয়; হাট-
ফেরা লোক মিলায় সোনার মেঘে এবং চোখের দ্বারে ধ্যানের আবেগে
নদীর সুদূরপারে যায় দেখা ঘাট।

কখন যে রাত্রি বাড়ে আলো-আঁধারিতে তেতলায়,
কিছুই পাই না টের সুরে ভেসে, ফ্ল্যাটে ফাহ্‌মিদার গলায়
আমার সোনার বাংলা ঝলমল ক'রে ওঠে। ঋণী তারই কাছে
আজীবন, কন্ঠে যার বারবার রবীন্দ্রনাথের গান বাঁচে।

কোনো কোনো কবিতার শিরোনাম

ডিমের খোলের অন্তস্তলে যেতে ভারী ইচ্ছে হয়।
সেখানে প্রস্থান করি যদি,
কেউ জানবে না,
কখনো আমার কোনো ক্রিয়ার খবর পৌঁছুবে না
কারুর কাছেই।
সেখানে একান্তে বসবাস করবার প্রিয় সাধ
কেবলি লতিয়ে ওঠে হলহল ক'রে
বিভিন্ন প্রহরে।
ফিরিয়ে উদ্বেগ-বিদ্ধ মুখ অত্যাচারী শব্দ থেকে
কুমারী নীরবতার বুক দেখে নেব নাচিকেত চৈতন্যে চকিতে।

ভাঙবো না নৈঃশব্দ্যের ধ্যান। করবো এমন কাজ, যখন যেমন খুশি,
যা' লঙ্ঘন করে না কখনো
শব্দহীতার সীমা—যেমন জামার
আস্তিন গোটানো কিম্বা চেয়ে থাকা অপলক, অথবা জুতোর
ফিতেটাকে ফুল সযত্নে বানিয়ে তোলা,
স্মৃতির নিকুঞ্জে
কোনো মনোহর শশকের প্রত্যাশায় ব'সে থাকা।

মধ্যে-মধ্যে নীরব থাকতে ভালো লাগে; নীরবতা
ফুল্ল উরু মেলে দিলে, মুখ রাখি তার নাভিমূলে।
তখন শব্দের ডাকাডাকি অত্যন্ত বিরক্তিকর,
এমনকি কবিতা লেখাও
ক্লান্ত বারবনিতার সঙ্গে সঙ্গমের মতো ঠেকে,
বুঝি তাই কোনো কোনো কবিতার শিরোনাম লেখার সময়
বড় লজ্জাবোধ হয়।

কোনো রমণীর জন্যে সারারাত ঘুমোতে পারি না,
সৌরভের মদে চুর দুর বোহেমিয়ান বাগান,
শহরে সার্কাস পার্টি এলো বহুদিন পর আর
স্পঞ্জের স্যান্ডেল পায়ে সন্ন্যাসী সটান হেঁটে যান
দুপুররুক্ষ বেলায় চেলার খোঁজে কোন্ আখড়ায়,
কোথাও লাইনস্‌ম্যান প্রাণপণে দোলাচ্ছে কেবলি
রাঙা বাতি তার,
অথবা আমার বুকে ঝারির মুখের মতো বহু ফুটো আছে—
কী এমন কথামালা এসব যাদের তন্তুগুলো
চাপিয়ে কাব্যের তাঁতে বুনে যেতে হবে রাত্রিদিন?

'এই যে যাচ্ছেন হেঁটে শরীর খদ্দরে ঢেকে, চোখে পুরু চশমা,
মাথায় পাখির বাসা, ইনি কবি; মানে,
করেন শব্দের ধনে প্রচুর পোদ্দারি'...শুনলেই পায়ে পায়ে
জোর লাগে ঠোকাঠুকি, কামড়ায় বিছে...
যেন খুব সাধবী দিবালোকে এভেন্যুর চৌমাথায়
প্রকাশ্যে ইজের খুলে দ্রুত
প্রস্রাব করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে গেছি
পুলিশের হাতে।

শব্দ, রাজেন্দ্রানী শব্দ কেবলি পিছলে যায়, যেমন হাতের
মুঠো থেকে স্তন,
তবু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে
নিতম্ব বুলিয়ে তার নিয়ে আসি ঘরে।
পায়চারি ক'রে আর সিগারেট পুড়িয়ে এন্তার,
গরম কফির পেয়ালায় ব্যাকুল চুমুক দিয়ে ঘন ঘন
একটি কবিতা শেষ ক'রে সুখে কোনো কোনোদিন
শিরোনাম লিখতে গিয়েই আচমকা ভারী লজ্জাবোধ হয়।

জেদী ঘোড়াটা

জেদী ঘোড়াটা তেজী ঘোড়াটা হাপয়ায় ছোঁড়ে
বারংবার কালো খুরের হাল্কা শব্দ।
স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে ওঠে প্রাণের তোড়ে,
দু'চোখে তার স্বপ্ন কিছু কাঁপছে ধু-ধু।

জেদী ঘোড়াটা তেজী ঘোড়াটা ছুটছে এই
ছুটছে ঐ শহর-গ্রামে, পরগণায় ;
ছুটছে শুধু, দীপ্ত পিঠে সওয়ার নেই।
দেখছে চেয়ে কৌতূহলী দশজনায়।

জেদী ঘোড়াটা তেজী ঘোড়টা ডাইনে বাঁয়ে
ভীষণ ছুটে ক্লান্ত হ'লে জুড়োয় পাড়া।
হঠাৎ কারা পরায় বেড়ী ঘোড়ার পায়ে ;
স্তব্ধ ঘোড়া, শকুনিদের চঞ্চু খাড়া।

বিবেচনা

সেদিনও কি এমনি অক্লান্ত ঝরঝর বৃষ্টি হবে এ শহরে ?
ঘিনঘিনে কাদা
জমবে গলির মোড়ে সেদিনও কি এমনি,
যেদিন থাকবো প'ড়ে খাটে নিশ্চেতন,
নির্বিকার, মৃত ?

আলনায় খুব
সহজে থাকবে ঝুলে শাদা জামা। বোতামের ঘরগুলো যেন

করোটির চোখ, মানে কালোর গহ্বর। জুতো জোড়া
রইবে প'ড়ে এক কোণে, যমজ কবর। কবিতার
খাতা নগ্ন নারীর মতোই চিৎ হ'য়ে
উদর দেখিয়ে
টেবিলে থাকবে শুয়ে আর দেয়ালের টিকটিকি
প্রকাশ্যেই করবে সংগম।

হয়তো কাঁদবে কেউ, আশা করা যেতে পারে; আত্মীয় স্বজন
কেউ কেউ শোকে ধোবে সত্তা। ঘরে পুড়বে আগরবাতি আর
কোরানের পুণ্য সব আয়াতে আয়াতে
হবে গুঞ্জরিত চতুষ্কোণ। বাজারে ছুটবে কেউ
চাটাই, বাঁশের খোঁজে; কেউবা ফুঁকবে সিগারেট
ঘন ঘন, কেউ মৃদু বলবে অদূরে, প্রতিবেশী একজন:
'লোকটা নাস্তিক ছিল, শরিয়তে মোটেই ছিল না
মন, মসজিদে তার সাথে কখনো হয়নি দেখা,
এবং নিষিদ্ধ দ্রব্যে ছিল তার উৎসাহ প্রচুর।
কিন্তু তবু কেন জানি বাস্তবিক কখনো ভুলেও
পারিনি করতে ঘেন্না তাকে।
মারেনি লাঠির বাড়ি মাথায় কারুর
কোনোদিন, উপরন্তু ছিল সদালাপী।'

যেদিন মরবো আমি, সেদিন কি বার হবে, বলা মুশকিল।
শুক্রবার? বুধবার? শনিবার? নাকি রবিবার?
যেবারই হোক,
সেদিন বর্ষায় যেন না ভেজে শহর, যেন ঘিনঘিনে কাদা
না জমে গলির মোড়ে। সেদিন ভাসলে পথ ঘাট,
পুণ্যবান শবানুগামীরা বড়ো বিরক্ত হবেন।

রৌদ্রে নিয়ে যাও

দ্বিধাকে সরিয়ে দূরে ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে
এখন তোমরা তাকে রৌদ্রে নিয়ে যাও। বড় বেশি
অন্ধকারে ছিল এতদিন, দিনগুলি ছিল তার
পেঁচার কোটরাগত। বড় বেশি অন্ধকারে ওরা
রেখেছিলো তাকে; অন্তর্জীবনের হলুদে পাতাগুলো
অন্ধকারে ডোবা আর তৃষিত শরীর তার পাকা
আনারের মতো ফেটে পড়তে চেয়েছে প্রতিদিন

রোদ্দুরের আকাংক্ষায়। হবে সে সূর্যের সেবাদাসী,
আজীবন সাধ ছিল তারও অথচ নিঃসঙ্গ ঘরে
প্রখর চৈত্রের ভরা দুপুরেও বিরূপ আঁধার
হঠাৎ বাদুড় সেজে উদ্ভিন্ন শরীরটাকে খুব
আলুথালু করেছে উন্মত্ততায়, তীব্র পাখসাটে।

রৌদ্রকে সে প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো নগ্নতায়
করেছে কমনা আর দুধ-শাদা স্বপ্নের অচেনা
গলিপথে দেখেছে অনেক কাঁটাবন, মরুভূমি,
গহ্বর পেরিয়ে আসা ক্ষুধার্ত বেখাপ্পা কয়েকটি
ক্রুদ্ধ পশু রাত্রিটাকে খুবলে খেতে পরম উৎসাহী—
যেন তারা তাড়াতাড়ি গলিপথে ভোর হোক চায়।

মরীচিকা-প্রতারিত আত্মা তার হরিণের মতো
চেয়েছে রাখতে মুখ রোদ্দুরের হ্রদে কতদিন।
কখনো বা রাত বারোটায় কিম্বা একটায় (তাই
অনুমান করা চলে) শরীরে বাড়ির ছায়া নেমে
এলে মৃদু মোমবাতি-আলোকিত চার দেয়ালের
চুন-সুরকি ভেদ ক'রে কতিপয় সন্ত আর মিহি

সোনালি চুলের দেবদূত আসতেন তার কাছে,
আঁধার শাসিত কণ্ঠে দিতেন পরিয়ে মালা ঠিক
আলোর মুক্তোয় গড়া। নিতেন মাথায় ঘ্রাণ আর
রাখতেন অলৌকিক হাত তার লাজুক মাথায়।
তখন চৈতন্যে দিব্যি উঠতো জ্ব'লে আশা ক্ষিপ্রতায়
ভুল সকালের মতো। বড় বেশি অন্ধকারে ছিল
ব'লে স্বপ্নভঙ্গে খেতো থতোমতো, যেমন সে কাজে
হঠাৎ জলের ঘড়া ভেঙ্গে ফেলে হতো অপ্রস্তুত।

শোনো, মৃত্যু বন্দনায় যুগ যুগ কাটিয়ে দিলেও
ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর, তার সত্তার শীতল
অন্ধকার কখনো হবে না দূর। ভীষণ আঁধারে
এতদিন রেখেছিলো তাকে ওরা; দয়ালু ব্যক্তিরা
অন্তত এখন তাকে অকৃপণ রৌদ্রে নিয়ে যাও।

পার্ক থেকে যাওয়া যায়

পার্ক থেকে যাওয়া যায়। গেলে ফুল মার্ক পাওয়া যাবে
তার কাছে। যদি মোমগন্ধী ইকারুস হয়ে যাই ফুল-চন্দন দেবে সে
গোধূলিতে। কিন্তু ইকারুস বড়ো পতনপ্রবণ। আকাশের
সুনীল বন্ধন তাকে পারে না রাখতে ধ'রে। পার্কময় আমি
কিম্বা আমাকেই পার্ক বলা যেতে পারে। রৌদ্রে জ্বলি, করি পান
আকণ্ঠ আরক শ্রাবণের,
কখনো-বা মগজকে নগ্ন তুলে ধরি কাঁচা দুধেল জ্যোৎস্নায়।

পার্কের বাইরে দেখি আইসক্রীমের শূন্য বাক্স নিয়ে কেউ
প্রত্যহ দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ কেউ বেশ ঘটা ক'রে
দোকান সাজায় নিত্য, বেচে না কিছুই কোনোদিন।
কে এক রাজকুমার আসবেন ব'লে

আসবেন ব'লে

আসবেন ব'লে প্রতিদিন ওরা অভ্যাসবশতঃ
যে যার দোকান নিয়ে অটল অপেক্ষমান, পণ্যহীন। এই পার্ক থেকে

যখন যেখানে খুশি যাওয়া যায় উজ্জ্বল সবুজ মেখে ট্রাউজারে, কানে
দখিন হাওয়ার গুলতানি পুরে, পাখিদের গান
শার্টের আস্তিনে গুঁজে এবং পকেটবন্দী রজনীগন্ধার শুভ্র ঘ্রাণ অকাতরে
বিলিয়ে সড়কে যাওয়া যায়, প্রভাতবেলার শান্ত প্রফুল্ল বন্দর ছেড়ে
দুপুরের মাঝ-দরিয়ায় ভেসে সূর্যের সোনালি সঙ্গ ছেড়ে
গোধূলির তটে যাওয়া যায়।

অতীতের শুকনো খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বহুদূর যাওয়া যায়, আপাতত
আমার গন্তব্য গলি। রাবীন্দ্রিক নয় মোটে, রবীন্দ্রনাথের
গলিঘুঁজি কাঁঠালের ভূতি, মরা বেড়ালের ছানা আর মাছের কানকা
সত্ত্বেও কেমন সুশ্রী। পার্কের পাথুরে বেঞ্চ ছেড়ে
আমি যে গলিতে যাবো নাম তার অলীক অক্ষর দিয়ে শুধু।

কোনো কোনোদিন হাসে সে-ও, প্রায় প্রতিদিন সে-গলির গাল
বেয়ে পড়ে লোনা জল। থাকে একজন, চোখে যার যুগপৎ
শতকের ধূমায়িত বিভীষিকা যৌবনের নিটোল কুহক। মাঝে মাঝে
ফুলেল তেলের মতো তার স্মৃতি আনে বিবমিষা।
তবু মনে হয়,
সত্বর সেখানে গেলে আমার অসুখ যাবে সেরে
নিবিড় স্বপ্নিল পথ্যে, একান্ত গহন কোনো নার্সময়তায়।
দেখবো গলির মোড়ে প্রস্তুত ফিটন, মেঘলোক-ফেরা ঘোড়া
খুরে খুরে অস্থিরতা ঝরাচ্ছে কেবল।
দুলিয়ে পা-দানী খুব উড়িয়ে স্মৃতির মতো স্বচ্ছ নীলাম্বরী
ফুরফুরে হাওয়া খেতে যাবে ভালবাসা,
আমার মোহিনী ভালবাসা।

রৌদ্রের মিছিল এলে রোঁয়া-ওঠা তোয়ালের মতো
আকাশের মোড়ে মোড়ে নক্ষত্র-বিপনী
বন্ধ করে ঝাঁপ।
আমরা এ ওর গায়ে ছায়া ফেলে পথ চলি; আমাদের হাতে
হলুদ ফেস্টুন কতো অথচ বেজায় খাঁ খাঁ লাল সালু। এ তল্লাটে কেনো
শ্লোগানের স্পষ্টতাই নেই। অতঃপর বিস্ফোরণ, ছত্রভঙ্গ কিছু মুখ,
পরিচিত
দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঃ দু'দল দুদিকে যায় অভিমানে গরগরে ক্রোধে।

তাহলে কোথায় যাবো ? একা-একা সার্কাস দেখাতে পারবো না
চৌরাস্তায়। অতএব পার্কে ফেরা ভালো, ভালো সেই
পণ্যহীন ফিটফাট কতিপয় দোকানীর কাছে গিয়ে সরাসরি বলা—
আমি তো রাজকুমার নই, আমার গালিচা নেই শূন্যচারী, তবু
তোমাদের কাছে ফিরে আসি খোলাচ্ছলে তোমাদের দোকানের শোভা
দেয় উস্কে কল্পনাকে। ভাবি, আজই পার্কের ভেতর
নিজস্ব সুহাস চারা করবো রোপণ, জল দেবো. নাম দেবো স্বাধীনতা।

হৃদয়ের গল্প

প্রেমিক শয্যায় তার কাতর মৃত্যুর প্রতীক্ষায়,
প্রাণের প্রতিটি তন্তু উন্মুখর রৌদ্রের ভিক্ষায়
সর্বক্ষণ; বীজানুর দামাল গেরিলাগুলি নিবিড় দঙ্গলে
রয়েছে গা' ঢাকা দিয়ে শিরা উপশিরার জঙ্গলে।
কখনো ওড়ায় পুল অতর্কিতে, কখনো টাওয়ার গুঁড়ো হয়
এক লহমায়। ভয়, সারা ঘরে ভয়।

ভাবে সে শয্যায় মিশে, ওষুধের ঘ্রাণে ডুবে ভাবে
কেবল সেসব পল অনুপল, যাদের অভাবে
জীবনের চিলে কুঠুরিতে অধিক জমতো আরো উর্ণাজাল,

ধুলো, পোকামাকড়ের শব। উন্মাতাল
অতীতের কথা ভাবে : পার্কের বেঞ্চিতে
কখনো বস্‌তো গিয়ে নিবিড় দু'জন কখনো বা খুব শীতে
রাস্তায় হাঁটতো ওরা। রেস্তোরাঁর দরজার আলো
প্রেমিকের চোখে ভাসে, যদিও ঘিরেছে তাকে মরণের কালো।

এখন প্রেমিকা তার রেস্তোরাঁয় তিনটি যুবার সাথে রাষ্ট্র
করে হৃদয়ের গল্প : রাঙা ঠোঁটে মিহি নড়ে কোকাকোলার স্ট্র।

প্রৌঢ় অধ্যাপকের মতে

বাছুরের মতো সব নাবালক কবিরা এখন
ঢুঁ মেরে বেড়ায় যত্রতত্র আর কচি তীক্ষ্ম খুরে
লণ্ডভণ্ড করে দেখি কাব্যের প্রশান্ত তপোবন।
গুঁড়িয়ে পদ্যের স্তূপ ক' বিঘা নিষ্ফল জমি জুড়ে
বানায় বিচিত্র ঢিপি। উপরন্তু বেয়াড়া পাঠক
তাদেরই লেজুড় হ'য়ে দিব্যি ঘোরে, যাক রসাতলে
কাব্যলোক; পুরোদমে যাচ্ছেতাই চলুক নাটক
ভীষণ পতন থেকে কবিতাকে উদ্ধারের ছলে।

এই সব বাছুরের দল জানি গোটাবে পাত্‌তাড়ি
দু'দিন ইয়ার্কি মেরে। আপাতত করে মুণ্ডপাত
রীতির নীতির আর সমস্বরে চেঁচিয়ে হঠাৎ
কাঁপায় কাঁচের ঘর, ভেঙে পড়ে থাম সারি, সারি।
হা কপাল, কালক্রমে বাছুরেরা হবে ধেড়ে ষাঁড়,
কল্কে দেবে বহুজন, হয়তো খেতাব পাবে "স্যার"।

তিনজন বুড়ো

চায়ের দোকানে ব'সে ঘেঁষাঘেঁষি তিনজন বুড়ো
অতীতের পাহাড়ের ঢালু বেয়ে তুষারের চূড়ো
ছুঁলো আর ভাসালো শরীর হ্রদে, প্রজাপতি-ছাওয়া
মাঠে ছুটোছুটো ক'রে ক্লান্ত হলো। যেন নাওয়া-খাওয়া
নেই কারো এভাবে রয়েছে ব'সে ওরা তিনজন
ছারপোকা কবলিত বিবর্ণ বেঞ্চিতে। ভন ভন
ওড়ে মাছি নাকের ডগায়, বুঝি ওরা এককাট্টা
গাইছে কাওয়ালী। নাড়ে, ওরা মাথা নাড়ে আর ঠাট্টা
মস্করা কথার ফাঁকে ফাঁকে চলে। কেউ তার উড়ো

কথাকে কিঞ্চিৎ নক্সী ক'রে তোলার আশায় গুঁড়ো
গুঁড়ো রঙ বর্ণনায় দিলো তোফা ছড়িয়ে ছিটিয়ে।
বললো সে, শোনো ভাই খুঁটিনাটি ফ্যাসাদ মিটিয়ে
বদলেছি বউ আমি জুতোর পাটির চেয়ে ঘন
ঘন।' ধোঁয়া ছেড়ে অন্যজন বলে, 'আমি গত গণ
অভ্যুত্থানে অহরহ দেখেছি তাসের রাজা কতো
গেছেন চকিতে ভেসে ম্লান বিশীর্ণ কুটোর মতো
বানের প্রবল তোড়ে, ঘটনার গলগ্রহ। বাকী
যে থাকে সে বলে না কিছুই, যেন সে দ্বিতীয় পাখি
উপনিষদের, দেখে শুধু দেখে গভীরে একাকী।

অজস্র মাইক্রোফোন

অজস্র মাইক্রোফোন রটায় শান্তির বাণী, অথচ সর্বত্র
তীব্র কুচকাওয়াজ চলছে অবিরাম। শান্তি-ছত্র
মেলে দিয়ে হিরণ্ময় হ'য়ে ওঠে সম্মেলন, শীর্ষ সম্মেলন
সম্ভাষণে। দিকে দিকে অবিরল প্রেসক্রিপশনের মতন

বিলি হয় শান্তি-সমর্থক পুস্তিকা ইত্যাদি আর
প্রেস ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার
ঘূর্নির্ল ফিল্মের রীল দ্রুত ভরে ওঠে শান্তিবাদী নেতাদের
নিম নেতাদের মুখের বিচিত্র ভঙ্গিমায়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের

ভবিষ্যত ভেবেই রাসেল আর্তস্বরে করেন সতর্কবাণী,
হয়তো দেখেন তিনি চরাচরে ডিনোসরাসের ভিড়, সব রাজধানী
বিশীর্ণ কংকাল হ'য়ে ভাসে তাঁর চোখে। এমনকি লম্বা চুল
সাবান-বিদ্বেষী হিপ্পিরাও কখনো ব্যাকুল
ঘোরে পথে পথে বোমা-তাড়ানিয়া বিক্ষোভ মিছিলে।

অস্ত্রাগারে সটান দাঁড়িয়ে সামরিক নায়কেরা ধীরে প্রশান্ত গলায়
ছড়াচ্ছেন আশ্বাসের বাণী আর ওড়াচ্ছেন শান্তির ফানুস
যখন তখন মরু, সমুদ্র পর্বত আর আকাশের নীলে।
এদিকে মানুষ সব সন্ত্রস্ত মানুষ
ক্রমাগত ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছে গাদা গাদা রাইফেলের তলায়।

ছবি

বনের হরিণ নয়, বক নয়, নয়কো ডাহুক,
ছেলেটা আনলো এঁকে খাপছাড়া মানুষের মুখ।
দিব্যি টেরিকাটা চুল, চোখ কান নেই তো কিছুই;
ঠোঁট আছে, খিল-আঁটা। ইচ্ছে করে ছবিটাকে ছুঁই,
আচম্বিতে আঁৎকে উঠি তার সঙ্গে নিজের মুখের
মিল দেখে ; ছবিটায় খোঁজ পাই আরো অনেকের।

ছেলেটা পাগল নাকি ?

ছেলেটা কখন ফেরে কতো রাতে কেউ তা জানে না।
রুক্ষ চুল, মাটিমাখা জুতো পায়ে চেনা
গলিটা পেরিয়ে আসে, ঢোকে ঘরে একা, নড়বড়ে
চৌকি দেয় কোল আর পাশের টেবিলে থাকে প'ড়ে
কড়কড়ে ভাত, ভাজা মাছ (মা জানেন ছেলে তার
খুব শখ ক'রে খায়) এবং পালং শাক, ডাল, পুদিনার
চাটনি কিঞ্চিৎ। অথচ সে পোরে না কিছুই মুখে, হ্যারিকেন
শিয়রের কাছে টেনে বই পড়ে, আর ভাবে কী-কী অহিফেন
জনসাধারণ আজ করছে সেবন বিভ্রান্তির চৌমাথায়।
দ্যাখে সে কালের গতি মার্কস আর লেনিনের প্রসিদ্ধ পাতায়।

সকাল হ'লেই ফের ব্যাকুল বেরিয়ে পড়ে, মা থাকেন চেয়ে—
দেখেন ছেলের মাথা ঠেকে ঘরের চেকাঠে, তাঁর চোখ ছেয়ে
চকিতে স্বপ্নের হাঁস আসে নেমে, পাথসাটে কতো
ছবি ঝরে সেকালের, ঝরে জ্যোৎস্না স্ফুলিঙ্গের মতো।
ভাবেন এমনি একরোখা, কিছুটা বাতিকগ্রস্ত ছিলেন তিনিও, মানে
যার পরিচয় এই দেহ-দ্বীপ, দুঃখের উপসাগর জানে।

'ছেলেটা পাগল নাকি ?'—প্রতিবেশী বুড়ো বললেন খনখনে
কন্ঠে তাঁর। 'পাগল নিশ্চয়, নইলে ঘরের নির্জনে
কেন দেয়নি সে ধরা', ভাবেন লাঠিতে ভর দিয়ে বুড়ো, 'নইলে কেউ বুঝি

মিটিংমিছিলে যায় যখন-তখন ? সব পুঁজি
খেয়ায়, ঘরের খেয়ে তাড়ায় বনের মোষ ? জীবনের সকাল বেলায়
গোলাপের মতো প্রাণ জনপথে হারায় হেলায় ?'

সন্ধ্যা

কোনো কোনো সন্ধ্যা যুবতীর জলার্ত চোখের মতো
ছলছল করে আর তখন নিজেকে
দেখি শুয়ে আছি
শবাধারে। ফুলের সম্ভার নেই, কৃষ্ণ গ্রহ এক প'ড়ে আছে পাশাপাশি।
মনে হয়, পুরোনো কাগজ, ভাঙা পাত্র,
বিলেতী দুধের শূন্য টিন
ইত্যাকার বাতিল বস্তুর মধ্যে ব'সে আছি একা
শহরতলীর হু হু ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরে।
তখন কালচে আকাশের পক্ষী-মালাকে ধূসর
বিদায়ী রুমাল ব'লে মনে হয় শুধু।

কবিতা

কখন যে ছেড়ে যাবে হঠাৎ আমাকে, কখন যে...
সেই ভয়ে রক্ত জমে যায় দইয়ের মতন।
যখন নিঃসঙ্গ
ব'সে থাকি ঘরে, বই পড়ি, শার্টের বোতাগুলো ছুঁই কিম্বা
এলাহী ডবল ডেকারের পেটে ঢুলি,
এমনকি ঘুমের মধ্যেও
সেই ভয় ভীষণ ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর।

যখন আমার চোখে চোখ রাখো, বাগানের তাজা
ফুলগুলো বাড়ায় আমার দিকে মুখ, ঝর্ণা নেচে
ওঠে হাতে, পাখি আসে খুব কাছে, তোমার চুম্বনে
জন্ম নেয় কতো পদাবলী।

হয়তো খেলছি ব্রিজ, হয়তো গিয়েছি ইস্টিশানে,
হয়তো পুরছি মুখে খাদ্য,

হয়েছি শামিল কোনো শবানুগমনে,
অকস্মাৎ সেই ভয় ঝানু যাদুকরের মতন
কালো পর্দা দিয়ে
ঢেকে ফেলে আমাকে সম্পূর্ণ :
কখন যে ছেড়ে যাবে হঠাৎ আমাকে, কখন যে·

প্রত্যাবর্তন

পুনরায় রৌদ্রহীন রৌদ্রে আমি, পথহীন পথে।

এই রৌদ্র, এই পথ কতকাল আমাকে অত্যন্ত
করেছে ব্যাকুল। বাইরের ক্ষীণতম শব্দ কিম্বা
একটি দৃশ্যের জন্যে পিপাসার্ত কাটিয়েছি অনেক বছর।
অনেক বছর আমি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কাটিয়েছি
হিরণ্ময় ভেন্টিলেটারের
স্বপ্ন দেখে দেখে। কতকাল কৃষ্ণচূড়া তৃষিত বুকের মধ্যে
দেয়নি ছড়িয়ে অগ্নি-গুঁড়া।

আমার মাথায় শাদা চুল ওড়ে হাওয়ায়, পুরানো
চটের থলের মতো শিথিল শরীর,
দাঁত নড়বড়ে,
দৃষ্টি নিবু নিবু আর জীবনের প্রতিটি মোর্চায়
যেন সান্ধ্য আইন হয়েছে জারি। রাস্তার কিনারে
বিশীর্ণ চাঁদের মতো নুয়ে-পড়া দর্জিটা এখনো
কী ব্যগ্র পরায় সুঁচে সুতো।

আমার যে-ঘর নেই
সে-ঘর আমাকে ডাকে বুক হাট ক'রে,
আমার যে-শয্যা নেই

সে-শয্যা আমাকে ডাকে বিশ্রামের স্বরে,
আমার যে-প্রিয়া নেই
ডাকে সে বুকের পদ্ম উন্মোচন ক'রে,
আমার যে পুত্র-কন্যা নেই
ডাকে তারা কচি চারাদের মতো বাহু মেলে দিয়ে।

পুনরায় রৌদ্রহীন রৌদ্রে আমি, পথহীন পথে।

ডাকছি

ডাকছি ডাকছি শুধু ডেকে ডেকে বড়ো ক্লান্ত আমি;
দেয় না উত্তর কেউ। সারাক্ষণ করি পায়চারি,
চৌদিকে তাকাই, ডাকি প্রাণপণে, এ-বাড়ি সে-বাড়ি
করি ঘন ঘন তবু পাই না কারুর দেখা। নামি
পথে একা, চৌরাস্তায় ভীষণ চেঁচাই। ফের থামি
আচম্বিতে, যেন কেউ বাস ছেড়ে সাত তাড়াতাড়ি
আসছে আমারই দিকে। আমি তাকে কী এলোপাতাড়ি
বলতে গিয়েই বোবা। পথে শূন্যতার মাতলামি।

যেন মৃত্যু অকস্মাৎ এ শহরে সব কটি ঘরে
দিয়েছে বাড়িয়ে হাত, শহরের প্রত্যেকটি ঘড়ি
হয়েছে বিকল আর শোক পালনের মতো কেউ
এখন কোথাও নেই। ভয়ানক নৈঃশব্দ্যের ঝড়ে
শহর-মরুর বুকে একটি কাঁকড়া শুধু তড়ি-
ঘড়ি যাচ্ছে ঠেলে ঠেলে ক্রমাগত শূন্যতার ঢেউ।

রাজকাহিনী

ধন্য রাজা ধন্য,
দেশজোড়া তার সৈন্য!

পথে-ঘাটে ভেড়ার পাল !
চাষীর গরু, মাঝির হাল,
ঘটি-বাটি, গামছা, হাড়ি,
সাত-মহলা আছে বাড়ি,
আছে হাতি, আছে ঘোড়া।
কেবল পোড়া মুখে পোরার

দু'মুঠো নেই অন্ন,
ধন্য রাজা ধন্য !

ঢ্যাম কুড় কুড় বাজনা বাজে,
পথে-ঘাটে সান্ত্রী সাজে।
শোনো সবাই হুকুমনামা,
ধরতে হবে রাজার ধামা।
বাঁ দিকে ভাই চলতে মানা,
সাজতে হবে বোবা-কানা।
মস্ত রাজা হেলে দুলে
যখন তখন চড়েন শূলে

মুখটি খোলার জন্য।
ধন্য রাজা ধন্য!

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় ?

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় ?
তেমন যোগ্য সমাধি কই ?
মৃত্তিকা বলো, পর্বত বলো
অথবা সুনীল সাগর-জল—

সব কিছু ছেঁদো, তুচ্ছ শুধুই।
তাইতো রাখি না এ লাশ আজ
মাটিতে পাহাড়ে কিম্বা সাগরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই॥

বর্ণ নিয়ে

পুরোটাই দৈবাৎ ঘটনা, বলা যায়। স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ
যেন ক্যারমের ঘুঁটি, বার বার উঠছে লাফিয়ে
আঙুলের ক্ষিপ্র ডগায় আমার; প্রথমেই স্বর
বর্ণের নকীব মানে আদ্যাক্ষর এলো, তার সঙ্গে
এলো তেড়ে শৈশবের সেই অজগর, যে পুস্তক
ছেড়ে ছুড়ে আচম্বিতে আমার খাতায়
উঠতো লাফিয়ে আর খাতা ছেড়ে চলতো বঙ্কিম কখনো-বা
হেলে দুলে মগজের তেপান্তর মাঠে। স্বরবর্ণের নিঃসঙ্গ আদ্যাক্ষর
ফুলবাবুটির মতো নিয়ে এলো হাতে
চমৎকার লাঠি মানে একটি আকার। তারপর
ব্যঞ্জন বর্ণের আদ্যাক্ষর এলো ভীষণ বেতালা কা-কা শব্দ
ক'রে এলো, আকারকে ইয়ার বক্সির মতো নিয়ে এলো টেনে।
অনন্তর ক্যারমের সেই মধ্যমণি ঘুঁটিটির
সমস্ত লালিম নিয়ে অন্তঃস্থ বর্ণের
তৃতীয় সদস্য এলো—আমার খাতার পাতা জুড়ে
কেবলি ক্ষুধার্ত চোখ, কেবলি ভিক্ষার পাত্র আর
শুধু ভিড়, তিল তিল ক্ষয়ে-যাওয়া প্রায়
উবে-যাওয়া অস্তিত্বের ছায়াচ্ছ মিছিল।

হাত

যায় না সে ভিড়ের ভেতর। সারাক্ষণ নির্জনতা
করে আহরণ।
কখনো সে-হাত টেলিফোনে চকরঙ নম্বরের
উদ্দেশে ব্যাকুল হয়, কখনো দেয়ালে ঝুলে থাকে

বিবর্ণ ছবির গায়। কখনো-বা মগজের রঙিন পুকুরে
বিলাসী সাঁতার কাটে, কেমন তন্ময় ছোঁয় গুল্মলতা।
ঘরের চালায় প'ড়ে থাকে আলস্যে কখনো
যেন বোহেমীয়ান সে একজন, ক্ষিপ্ত,
ধারে না কারুর ধার। অবহেলে রাখে ধ'রে রৌদ্র ছায়া আর
বৃষ্টির ধবল দাঁত কামড়ালে নাচে, বেজে ওঠে
দমকা হাওয়ায়।

সে হাত পায়রা হ'য়ে কোলে আসে কিম্বা দোলে খুব
শূন্য দোলনায়, কবেকার আবছায়া জলছবি কতিপয়
কুড়িয়ে আনে সে, রেডিয়োর কাছে এসে শব্দহীন
নিবিড় ঘুমিয়ে থাকে বেড়ালের মতো।
সে হাত চকিতে
বেদের ঝাঁপির মধ্যে শঙ্খিনীর সঙ্গে
অন্তরঙ্গতায়
মোহন সুনীল হয়, জেলেদের আমিষ পাড়ায়
রৌদ্রে মেলে দেয়া জালে বাঁধা পড়ে স্বেচ্ছায় কখনো।

রুপোলি মাছের মতো নক্ষত্র নিকুঞ্জ,
শহরের দূরতম এলাকার নিভৃত বল্মীক.
নানাবিধ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির দোরগোড়া থেকে
ফিরে এসে এখানেই সে-হাত লুটায় কাটা ঘুড়ির মতন।

বাঁশি তাকে ডাকে,
ডাকে সাত রঙ,
শোনে সে আহ্বান পাথরের।

ভোরে কাঁচা কবরের ওপর ঘুমিয়ে কখন কী স্বপ্ন দ্যাখে.
সে হাতের মৃত্যুভয় নেই।

ব্যাকুলতা

আমার সিঁড়ি আগলে থাকে
ব্যাকুলতা।
পেছনে থেকে চুল টানে সে
হঠাৎ বাঁধে আলিঙ্গনে,
আমার সিঁড়ি আগলে থাকে
ব্যাকুলতা।

হাওয়ায় ঘোরায় চাবির গোছা,
যেন আমার ঘরণী সে;
দুপুর বেলা কখন খাটে
দেয় এলিয়ে শরীরটাকে,
ব্যাকুলতা।

বাসের ভিড়ে দোকান পাটে
পার্কে ধূসর বেঞ্চিটাতে
আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে
ব্যাকুলতা।

যখন লিখি কিম্বা খুলি
সদ্য কেনা বইয়ের পাতা
তখন পিঠে নিশ্বাস ফেলে
ব্যাকুলতা।

রোদ খেলানো বসফরাসে
কিম্বা বুড়ীগঙ্গা তীরে
আচম্বিতে আমার বুকে
দ্যায় তুলে সে ছদ্মবেশী
দুঃখ সুখের শিল্পকলা
ব্যাকুলতা।

একপাল জেব্রা

এই ঘরের শব্দ আর নৈঃশব্দ্যকে সাক্ষী রেখে,
সাক্ষী রেখে আস্তাবলের গন্ধ, দক্ষিণের তাকে রাখা
শূন্য কফির কৌটো, বারান্দায় শুকোতে দেয়া হাওয়ায়
দু'লে ওঠা শাদা শার্ট, যে শার্টের কলার একবার
কোনো বেজায় সাংস্কৃতিক মহিলার লিপস্টিক ভূষণে
সজ্জিত হয়েছিলো, উজাড় মানি-ব্যাগ
আর দর্পণের সুহৃদকে সাক্ষী রেখে লিখি কবিতা।

নিপুণ গার্ডের মতো হুইসিল বাজাতে বাজাতে সবুজ ফ্ল্যাগ
ওড়াতে ওড়াতে একটি কবিতার শাঁ শাঁ ট্রেনকে
অন্তিম স্টেশনে পৌঁছে দিতে না দিতেই
কিছু পংক্তি পেয়ে বসে আমাকে আবার। দুর্দান্ত
এক পাল জেব্রার মতো ওরা আমার বুকে ধুলো উড়িয়ে বারংবার
ছুটে যায়, ফিরে আসে।

ক্ষমা করুন রবীন্দ্রনাথ, আপনার মহান মায়াবী শৈলাবাস থেকে,
ভুল বুঝবেন না নজরুল, আপনার হার্মোনিয়ামের আওয়াজে
মধুর মজলিশ আর হাসির হুল্লোড় থেকে,
কিছু মনে করবেন না জীবনানন্দ, আপনার স্যুররিয়ালিস্ট হরিণেরা
যেখানে দৌড়ে যায়, সেখান থেকে,
মাফ করবেন বিষ্ণু দে, আপনার স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত থেকে
অনেক দূরে যেতে চায় সেই দামাল জেব্রাগুলো।
আমি একলা প্রান্তরের মতো প'ড়ে থাকি। জেব্রগুলো তুমুল
উন্দামতায় মেতে ওঠে, তাদের উত্তপ্ত নিশ্বাসে
আমাদের হৃদয়ের অন্তর্লীন তৃণরাজি শিখার উজ্জ্বলতা পায় কখনো,
ফিরে আসে না আর। আমি একলা প্রান্তরে ডাকতে ডাকতে
ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি, ওরা ফিরে আসে না তবু। প'ড়ে থাকি

অসহায়, ব্যর্থ। তখন দুঃক্ষোভে নিজেরই হাত
কামড়ে ধরতে ইচ্ছে হয়, আমার প্রিয়তম স্বপ্নগুলোর
চোখে কালো কাপড় বেঁধে গুলি চালাই ওদের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য ক'রে।

নিপুণ গার্ডের মতো হুইসিল বাজাতে বাজাতে, সবুজ ফ্ল্যাগ
ওড়াতে ওড়াতে একটি কবিতার শাঁ শাঁ ট্রেনকে
অন্তিম স্টেশনে পেঁাছে দিতে না দিতেই আবার এক পাল জেব্রা
তুমুল ছুটোছুটি করে বাতাস চিরে রৌদ্র ফুঁড়ে আমার বুকের আফ্রিকায়।

বিড়ম্বনা

ভেবেছি তোমাকে পার্কে নিয়ে যাবো, অথচ সেখানে
উঠতি গুণ্ডার টাণ্ডিক, শিস।
ভেবেছি তোমাকে নিয়ে দু'দণ্ড বসবো রেস্তোরাঁয়,
সেখানেও হ্যাংলা আর ফড়েদের ভিড়ে টেঁকা দায়।
ভেবেছি তোমাকে নিয়ে রাস্তায় ঘুরবো চমৎকার,
অথচ প্রতিটি পথে ক্ষুধার্তের ভীষণ চীৎকার।
ভেবেছি তোমাকে নিয়ে বৈকালিক নৌকো বিহারের
আনন্দ কুড়াবো ঢের,
কিন্তু বন্যাস্ফীত জলে ভাসে মৃত মানুষ, মহিষ।

পক্ষপাত

ঘাসের নিচের সেই বিষাক্ত সাপকে ভালবাসি,
কেননা সে কপট বন্ধুর চেয়ে ক্রূর নয় বেশী।
ভালবাসি রক্তচোষা অন্ধ বাদুড়কে,
কেননা সে সমালোচকের চেয়ে ঢের বেশী অনুকম্পাময়।
রাগী বৃশ্চিকের দংশন আমার প্রিয়,

কেননা সে দংশনের জ্বালা অবিশ্বাসিনী প্রিয়ার
লাল চুম্বনের চেয়ে অধিক মধুর।
আমি কালো অরণ্যের সুকান্ত বাঘকে ভালবাসি,
কেননা সে একনায়কের
মতো কোনো সুপরিকল্পিত
সর্বাগ্রাসী শত্রুতা জানে না।

টিকিট

একটি টিকিট আমি বহুকাল লুকিয়ে রেখেছি
সযত্নে বুকের কাছে। আশেপাশে সর্বক্ষণ যারা
ঘুরছে তাদের বড়ো লোভ এই টিকিটের প্রতি।
এক একটি দিন যায়, সে-টিকিট অলক্ষ্যে সবার
কেবলি সোনালি হয়। হোন্ডায় সওয়ার আঁটো যুবা,
বেসামাল ট্রাক ড্রাইভার, বাস কণ্ডাক্টার আর
শাদা হাসপাতালের দারোয়ান এবং এয়ার
হোস্টেস সবাই চায় সে-টিকিট আমার নিকট।

সেদিনও জ্বরের ঘোরে দেখলাম, একজন কালো
শিশিটার অন্তরালে সুদূরের কুয়াশা জড়ানো
শরীরে দাঁড়ালো এসে, বাড়ালো খড়ির মতো হাত
সাত তাড়াতাড়ি তপ্ত আমার বুকের দিকে সেই
টিকিটের লোভে, আমি প্রবল বাধায় তাকে দূরে
সরালাম। আরো কিছুকাল রাখতেই হবে ধ'রে
এ টিকিট রাখতেই হবে বুকের একান্ত রৌদ্রে,
জ্যোৎস্নায় বানানো পকেটের হুহু জনহীনতায়।

প্রকারভেদ

সুকণ্ঠ কোকিল তুমি বসন্তের মাতাল নকীব,
মধ্যরাতে বিপর্যস্ত ক'রে ফেলো এখনো আমাকে,
নিদ্রার গহন থেকে নিয়ে যাও পাতার টেরেসে।

হাঁস তুমি ব্রজেন দাশের মতো কাটছো সাঁতার
পাড়ার পুকুরে যথারীতি। নিঃসঙ্গ কুকুর তুমি
শহরের নানা দৃশ্য রাখছো দু'চোখে; টিকটিকি
যখন-তখন তুমি ডেকে ওঠো, দেয়ালের মাঠে
দিব্যি ফুলবাবু সেজে হাওয়া খাও প্রত্যহ দু'বেলা।

কোকিল, কুকুর, হাঁস, টিকটিকি ইত্যাদি ইত্যাদি
আটক করে না জেলে তোমাদের কেউ কিম্বা
গোয়েন্দা নেয় না পিছু, তোমাদের অলিতে গলিতে
কারফ্যু হয় না জারী অতর্কিতে। তোমাদের কেউ
করে না শোষণ কোনোদিন; কেননা তোমরা নও
ঈর্ষণীয় সেই জাতি বস্তুত মানব যার নাম।

সোনার তরী

'এই রোকো' ব'লে কোনো জাঁদরেল ট্রাফিক পুলিশ
পারে না করতে রোধ কখনো তোমার পথ কিম্বা
চেকপোস্টে তোমাকে হয় না জমা দিতে পাসপোর্ট
ভিসা; বক্ষে বাজিয়ে মোহন বাঁশি আসো মহারাজ
মায়াবী সংসারে অপরূপ অগোচরে। কোনোদিন
ঝকঝকে বাসস্টপে, মাথা-ঝলসিত ফুটপাতে
অথবা পার্কের বেঞ্চে ব'সে জুতোর কাদার দিকে
অনিমেষ তাকিয়ে থাকার ক্ষণে, টেলিফোনে কথা
বলতে বলতে মৃদু এমনকি মফস্বলগামী
ট্রেনের বগিতে চুলে, কবিতার কাঙাল আমরা,
অকস্মাৎ পেয়ে যাই তোমার সাক্ষাৎ। প্রতিদিন
তোমার জন্যেই কতো দখিন দুয়ার থাকে খোলা।

এ শহরে স্বপ্নের দোকান নেই কোনো, আছে শুধু
দরাদরি, বচসাও অন্তহীন। হলুদ দাঁতের

কিছু লোক, বেসামাল, এমনকি অন্ধ ভিক্ষুকের
দোতারাও নেয় কেড়ে দারুণ আক্রোশে; চৌরাস্তায়
দাপায় লাফায় আর কালো পিরহানে ঢেকে ফেলে
সবগুলো উজ্জ্বল মিনার। উপরন্তু বল্মীকের
উপদ্রবে ক্রমাগত হচ্ছে নোংরা প্রতিটি সোপান।
এরই মধ্যে তুমি আসো কাব্যের মহান সান্তা ক্লস।

নিষ্প্রদীপ ঘরে থাকি রাত্রিদিন। দরজা-জানালা
বন্ধ সব। বড়ো শ্বাসকষ্ট হয়; হঠাৎ কখনো
ইচ্ছে করে 'এ্যাম্বুলেন্স চাই' বলে তারস্বরে দূর
আকাশ ফাটাই। কখনো-বা মাছ শিকারীর মতো
ব'সে থাকি, নিবিড় অপেক্ষমাণ। এ বন্ধ ঘরেও
ভিড়ছে সোনার তরী, আপনারা স্বচক্ষে দেখুন।

মাতামহের মৃত্যু

অনেক পায়ের নিচে তিনি;
        মাটির পালঙ্কে শুয়ে অবসর ভোগ
        করছেন যেন আরামের
সুশান্ত চাদরে ঢেকে আপাদমস্তক।
আমরা ওপরে স্তব্ধ, প্রায়-স্তব্ধ, নিচে তিনি। আমার পিতার
কালো আচকানটার, দেখলাম, একটি বোতাম নেই; ঢোলা
পাজমায় ভেজা মাটি। আমার নতুন হাফপ্যান্টে
হঠাৎ কাদার ফুল ফুটেছে দেখেই মনমরা
        হলাম কেমন।

আমাদের পায়ের তলায় মাতামহ,
        মাটির গভীরে মাতামহ,
মাতামহ এক খন্ড হুহু শাদা কাপড়ের মোড়কে জড়ানো,

যেন প্রেরিতব্য সওগাত কোনো, যাবেন সুদূরে।
একজন ফেরেস্তা গাছের মগডালে, নাক তার মাতামহের ফরাসির
নলের মতন আর চুল আগুনের ঝোপ, গোঁফে
প্রজাপতি বাঁধা পড়ে গেছে; হাতে টফির রঙিন বাক্স নিয়ে
বিড় বিড় পড়ছে দরুদ।

কান্না-ক্লান্ত কিছু মুখ। কেউ শূন্য দৃষ্টি মেলে চায়,
চেয়ে থাকে দূর মসজিদের মিনারে, কেউ খুব
মগ্ন হ'য়ে দেখে নেয় কবর তৈরীর শিল্প। আমার নিজের
কান্না পাচ্ছিলো না ব'লে লজ্জা বোধ হ'লো। মধ্যে মধ্যে
শুধু মাতামহের ঘরের মালিশের ঝাঁ ঝাঁ গন্ধ এলো ভেসে (পক্ষাঘাত
পঙ্গু করেছিলো তাঁকে) উজিয়ে অনেক ঘর, বিশীর্ণ হলুদ গাছপালা,
ঊর্ণাজাল। তাল তাল মাটি ঝড়ে পড়ে মাতামহের ওপর,
সবাই মাটির ঢেলা সাগ্রহে দিলেন ছুঁড়ে তাঁর
প্রতি, যেন কী এক খেলায় উঠলেন মেতে আর
আমি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তখন
আইসক্রীমের কথা শুধু ভাবছিলাম আড়ালে।

অকথ্য এক অন্ধকারে

অকথ্য এক অন্ধকারে মগ্ন আমি
খুপরিটাকে আঁকড়ে ধ'রে;
বাঁচার নেশা অদ্যাবধি বেশ ঝাঁঝালো,
তাইতো টিকি এই শহরে।

জগৎ জুড়ে জোর কলহ চলছে এখন,
উলুখড়ের ঘোর বিপদ।
এরই মধ্যে চায়ের বাটি সামনে রেখে
রাজা উজির করছি বধ।

বুঝতে পারা সহজ তো নয় পাচ্ছি কী-যে
মজা খালের কাদা সেঁচে।
অকথ্য এক অন্ধকারে, স্বীকার করি,
মন্দ-ভালোয় আছি বেঁচে।

জানলা ছেড়ে শীতের কালো সন্ধ্যাবেলা
ফের টেবিলে কথার গানে
মত্ত হ'য়ে রাত্রি জেগে পদ্য লিখে
বেহুঁশ খুঁজি বাঁচার মানে।

লেখার ফাঁকে ছন্দ মিলের হাতছানিতে
মধ্যপথে খন্দে পড়ি,
রেশমী কোনো শবদ শুনে ব্যাকুল হ'য়ে
আবার নতুন ছন্দে নড়ি।

শয্যা ছেড়ে সিঁড়ির ধাপে হঠাৎ থেমে
চড়ুইটাকে ডাকি কাছে।
আমার হাতের নড়া দেখেই লেজ দুলিয়ে
পালায় চড়ুই সজনে গাছে।

আমার ওপর ছোট্ট পাখির নেই ভরসা,
পালায় দূরে কিরাত ভেবে।
চতুর্দি'কে খুনখারাবি আছেই লেগে,
চড়ুইটাকে দোষ কে দেবে ?

এ যুদ্ধের শেষ নেই

এ যুদ্ধের শেষ নেই। প্রতি পল অনুপল শুধু
গোলা বর্ষণের ধুম, ক্রুদ্ধ এরোপ্লেনের ছোঁ মারা

চলে অবিরাম, চূর্ণ ব্রিজ। সাবমেরিন হঠাৎ
ফুটো করে জাহাজের তলা। ট্রেঞ্চ খুঁড়ি প্রাণপণে,
কখনো মাইন পাতি সুকৌশলে : একান্ত জরুরী
শত্রুকে ঘায়েল করা ছলে বলে। দিগন্ত-ডোবানো
চীৎকারে চমকে উঠি, প্রেতায়িত পড়ে থাকে কতো
মাটি-মগ্ন হেলমেট, শতচ্ছিন্ন টিউনিক, হাড়।

রাজত্ব জয়ের নেশা শিরায় তুমুল নাচে আজো
ঝাঁঝালো জ্যাজের মতো। কিন্তু জানা নেই সে-রাজ্যের
মৌলিক সীমানা। শুধু জানি ভীষণ ছুটতে হবে,
বিশ্রাম অকল্পনীয়, অসম্ভব রণে ভঙ্গ দেয়া।

কখনো নিঃসঙ্গ ট্রেঞ্চে রসদ ফুরিয়ে আসে, এক
টুকরো সিগারেট ফুঁকি কতো বেলা। শূন্য টিন আর
উজাড় মগের দিকে চেয়ে থাকি সতৃষ্ণ, কাতর।
কখনো জ্বরের ঘোরে দেখি, ওরা আসে উদ্ধারের
প্রবল আশ্বাস নিয়ে—বিশেষণ, বিশেষ্য এবং
ক্রিয়াপদ, আমার আপন সেনা, ওরা আসে; কিন্তু
তারাই আমার শত্রু, অতর্কিতে করে আক্রমণ—
ঘামে-ভেজা ক্লান্ত চোখে দোলে জয়, দোলে পরাজয়।

ময়ূরগুলো

আমার বুকে রাতবিরেতে
রাতবিরেতে ময়ূরগুলো
বেড়ায় নেচে।
রক্তে আমার ভীষণ ডাকে
ভীষণ ডাকে ময়ূরগুলো
রাতবিরেতে।

নখর-ঘায়ে বুকের টালি,
হৃদয়পুরের চার কুঠুরি
নাকাল হলো।
মাথার ভেতর পেখম তোলে,
চঞ্চু রাখে ঘাড়ে মুখে,
রক্ত মোছে।

চঞ্চু থেকে ঝরায় কী-যে,
ঠুকরে বেড়ায় অনেক কিছু
মাতাল হ'য়ে।
ব্যগ্র আমার পায়ের ছাপে
একলা ঝোড়ো ঘরের মেঝে
তপ্ত হলো।

ঘরকে আমার শ্মশান বলি,
রাতবিরেতে শয্যা যেন
দারুণ চিতা।
বিধবাদের নিদ্রাহারা
প্রহর শুধু আমায় জোরে
দখল করে।

তীব্র চোখের ময়ূরগুলো
খাদ্যাভাবে আমায় ছেঁড়ে
সিক্ত লোভে।
ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে উঠি,
ইচ্ছে করে আকাশ ছিঁড়ি
দশটি নখে।

হঠাৎ দেখি মুখ রেখেছি
গন্ধভরা রেশমী ঝোপে;
মত্ত আছি

যমজ ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে।
যুগল টিলা মুঠোয় কাঁপে
অন্ধকারে।

গুপ্ত শিরার লাল মদিরা
ফেনিয়ে ওঠে রাতবিরেতে
বিনোদ চেয়ে।
আমার বুকে, মাথার ভেতর
নেচে বেড়ায় ময়ূরগুলো
ময়ূরগুলো।

এ শহর

এ শহর টুরিস্টের কাছে পাতে শীর্ণ হাত যখন তখন,
এ শহর তালিমারা জামা পরে নগ্ন হাঁটে, খোঁড়ায় ভীষণ।
এ শহর রেস খেলে, তারি গেলে হাঁড়ি হাঁড়ি, ছায়ার গহ্বরে
পা মেলে রগড় ক'রে আত্মার উকুন বাছে, ঝাড়ে ছাড়পোকা।
কখনো-বা গাঁট কাটে, পুলিশ দেখলে
মারে কাট। টকটকে চাঁদের মতন চোখে তাকায় চৌদিকে,
এ শহর বেজায় প্রলাপ বকে, আওড়ায় শ্লোক,
গলা ছেড়ে গান গায়, ক্ষিপ্র কারখানায়
ঝরায় মাথার ঘাম পায়ে।
ভাবে দোলনার কথা কখনো সখনো,
দ্যাখে সরু বারান্দায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির রূপ।

এ শহর জ্যৈষ্ঠে পুড়ে এবং শ্রাবণে ভিজে টানে
ঠেলাগাড়ী, রাত্রি এলে শরীরকে উৎসব করার
বাসনায় জু'লে সাত তাড়াতাড়ি যায় বেশ্যালয়ে।
এ শহর শাদা হাসপাতালের ওয়ার্ডে কেবলি
এপাশ ওপাশ করে, এ শহর সিফিলিসে ভোগে,

এ শহর পীরের দুয়ারে ধর্ণা দেয়, বুকে-হাতে
ঝোলায় তাবিজ তাগা, রাত্রিদিন করে রক্তবমি,
এ শহর কখনো হয়না ক্লান্ত শবানুগমনে।
এ শহর দারুণ দুক্ষোভে ছেঁড়ে চুল, ঠোকে মাথা
কালো কারাগারের দেয়ালে,
এ শহর ক্ষুধাকেই নিঃসঙ্গ বাস্তব জেনে ধুলায় গড়ায়;
এ শহর পল্টনের মাঠে ছোটে, পোস্টারের উল্কি-ছাওয়া মনে
এল গ্রেকো ছবি হ'য়ে ছোঁয় যেন উদার নীলিমা,
এ শহর প্রত্যহ লড়াই করে বহুরূপী নেকড়ের সাথে।

কতোবার ভাবি

কতোবার ভাবি তার উদ্দেশে লিখবো না আর কবিতা।
প্রতিটি শব্দে ব্যথার তুষার জমিয়ে
কবিতা-মুক্তো কোনদিন তাকে করবো না উৎসর্গ।

সেই কবে তার কেশতরঙ্গে হৃদয় টালমাটাল
নৌকোর মতো প্রহরে প্রহরে নিত্য উঠতো দুলে,
সেই আমাদের জীবন-রাঙানো বনভোজনের দিন,
সূর্য ডোবার মুহূর্তে মৃদু স্বর দিয়ে প্রাণ ছোঁয়া,
পাহাড়ি পথের ঝর্নার ধারে উড্ডীন পাখি দেখা—
এসব খুচরো ঘটনাবলীর স্বাক্ষর আজো বই।

আমার ওষ্ঠ তার ওষ্ঠের গাঢ় বন্দরে
ভিড়তে অধীর হয়েছে যখন,
মৃত চড়ুইটা পড়েছিলো চুপ মেঝের উপর,
হাওয়ায় জড়ানো স্তব্ধ শরীর।
নৈঃশব্দ্যের হৃদপিণ্ডের মতো আমরাও
যুগ্ম দোলায় কেঁপেছি শুধুই।

উথালপাথাল ঢেউয়ের চূড়ায় হৃদয়ের সাঁকো
ভেসেছে চকিতে একদা যখন,
দুপুরের লাল এজলাসে দুলে জারুলের শাখা
করেছিলো বুঝি জজিয়তি খুব।
আমাদের প্রেম ফুলের মতন উঠেছিলো ফুটে,
তোমরা বলতে পারো।
আমাদের দেখে সন্ধ্যার মেঘ উঠেছিলো জ্ব'লে,
তোমরা বলতে পারো।

কতোবার তাকে এইতো এখানে, মানে খোলা এই
বরান্দাটায়
অথবা ঘরের সুশ্রী ছায়ায় চেয়ারে বসিয়ে
হয়েছি নিবিড়।
এই ব'সে থাকা, কথা বলা আর কথা না-বলা,
কিছু বিশ্বাস
কিছু সন্দেহ, কিছু রোমাঞ্চ—এইতো প্রেমের
ভাষান্তরণ।

তার সে বুকের নাক্ষত্রিক অলিন্দ আর
চোখের বাগানে হাতের মহলে অবক্ষয়ের
দারুণ বেলায় কার অধিকার ? সেই তথ্যের
মূল্য কী আজ ? সময়তো এক তুখোড় পাচক,
সোনালী রুপালি ল্যাজা-মুড়ো সব হাতায় হাতায়
করে একাকার। আমাকেও তার হাঁড়িতে চাপিয়ে
দিচ্ছে তীব্র জাঁহাবাজ আঁচ। অবান্তরের
আবর্জনায় অনেক কিছুই চাপা প'ড়ে যায়।
সেই জঞ্জালে প্রায়-নিভন্ত অংগার এক
রটায় হওয়ায় : একদা কখনো সে ছিল আমার।

আমার স্বরের ব্যাকুল কোকিল—ভাবি রাত্তিরে মিশে—
কখনো আবার পেঁৗছে যাবে কি তার বাসনার নীড়ে ?
এই মুহূর্তে সে যদি আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে,
চোখ জেবলে রাখে চোখের-ওপর, চুন-খসা দেয়ালের
বয়েসী ঘড়ির নিশ্চলতায় জাগবে কি ফের দোলা ?
আগের মতোই হৃদয় আমার আরক্ত নাচ হবে ?
এর যথার্থ উত্তর দিতে আমার ভীষণ বাধে।

এ-যুগে শুনেছি, রটায় সবাই, হৃদয় থাকাটা বিপজ্জনক;
ভালোই হয়েছে, সুনীল নেকড়ে ছিন্নভিন্ন করেছে হৃদয়।
অতীত-প্রেতের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় শিহরিত ঘাস; মরা পাখিদের
ভয়ানক শাদা কংকাল নিয়ে খুব খসখসে কাগজের মতো
এলোমেলো আর ছেঁড়া-খোঁড়া সব পাখা নিয়ে মাঠ হাহাকার হয়।

কতোবার ভাবি তার উদ্দেশে লিখবো না আর কবিতা,
তবু তার প্রেত অতনু স্মৃতির রুমাল ওড়ায়

আমার রচিত শব্দে,
গন্ধ বিলায় ছন্দে।

পশু বিষয়ক কবিতা

খুব জনসমাগম হয়েছিলো; ছেলেমেয়েগুলো ঘর ছেড়ে
পার্ক ছেড়ে, মাঠ ছেড়ে রাঙা ঘুড়ি এবং বেলুন
ওড়াতে ওড়াতে,
মহিলারা সেজেগুজে বাতাসে মেয়েলী ঘ্রাণ ছড়াতে ছড়াতে
সেখানে নিবিড় এলো, যুবকেরা ছিমছাম, কেউ কেউ রাগী
দৃষ্টি মেলে চারদিকে এলো ভিড়ে, বুড়োরা স্মৃতির
পদশব্দ শুনে-শুনে।

খাঁচার ভেতরে কিছু জমকালো পশু। স্বাস্থ্যল পেশীর খেলা
ভালো লাগে, বুঝি তাই খুব জনসমাগম হয়েছিলো। বন ছেড়ে এই
সংকীর্ণ খাঁচায় যতটুকু ভালো থাকা যায় খেয়ে দেয়ে কিম্বা
আলস্যে ঝিমিয়ে,
ভালো আছে ওরা সব। হঠাৎ লাফায় কেউ, দোল খায় কেউবা মজায়,
একজন করে ঘোরা ফেরা, যেন গিন্নী ডেপুটির,
এবং শিম্পাঞ্জীটিকে দেখে মনে হয় দেকার্তের
শাণিত পাতার স্বাদ জানা আছে তার। কেউ এত পায়চারী
করছে ভারিক্কী চালে, যেন হোমরা চোমরা নেতা কেউ,
এক্ষুনি ধরবে ছেঁকে তুখোড় রিপোর্টারের ঝাঁক।

পরিচর্যা চলে যথারীতি, বস্তুত খাঁচায় নেই
খাদ্যাভাব উপরন্তু দর্শকেরা শৌখিন আদরে
দেয় খেতে ছোলা কলা ইত্যাদি, ইত্যাদি। দূরে থেকে
ক'জন ভিখারী, লুব্ধ দৃষ্টি, চ'লে যায় মাথা হেঁট ক'রে।

মা

ছিলেন নিভৃত গ্রামে। সর্বক্ষণ সংসারের খুঁটিনাটি কাজে
মগ্ন, আসমানে রৌদ্র কাঁপে, মেঘের পানসি ভাসে, কখন যে ক'টা বাজে
থাকে না খেয়াল কিছু। দৃশ্য খুবই চেনাশোনা, মৃদু রঙমাখা,
নানা সূক্ষ্ম সূত্রে গাঁথা; চুলায় চাপানো হাঁড়ি পুঁই শাক-ঢাকা
মাছ পড়ে গোটা দুই শিক্ষক স্বামীর পাতে। লাউয়ের মাচায়
কখনো রাখেন চোখ, কাঁঠাল গাছের ডালে হলদে পাখী লেজটি নাচায়
ঘন ঘন, বেলা বাড়ে। ইঁদারার পানিতে গোসল সেরে কাঁচা পাকা চুলে
চালান কাঁকই দ্রুত আর ভাবেন খোকন স্কুলে
নামতা মুখস্থ করে। বৈয়মে রাখেন নক্সী পিঠা, মনে পড়ে
বড় ছেলেটির কথা, চোখ যার বড় বেশী জ্বলজ্বলে, পড়াশোনা করে যে শহরে।

এ বাড়ির গণ্ডি ছাড়া কোথায়ও পড়েনা তাঁর পায়ের পাতার
কালো ছাপ, সারাক্ষণ থাকেন আড়ালে আর খসে না মাথার

কাপড় ভুলেও কারো সম্মুখে কখনো। বেঁচে নেই বাপজান
আম্মাও ওপারে আজ, তবু মাঝে-মাঝে প্রাণ করে আনচান।

ক্রুদ্ধ দেবতার মতো তোলে মাথা সারা দেশ।
কতো যে খবর আসে, কতো আত্মদান
রাঙায় দেশের মাটি; সন্তানের রক্তমাখা জামার আহ্বান
টানে গ্রাম্য জননীকে। অনেক পেছনে রইলো প'ড়ে
লাউয়ের সবুজ মাচা, নদী, মাঠ,
কলাইয়ের ক্ষেত আর পুকুরের ঘাট।
পড়ছে পায়ের ছাপ আজ তাঁর জনপথে, আনাচে কানাচে, সবখানে
মেলালেন পুত্রহীন হৃদয়ের দীপ্ত কান্না শ্লোগানে, শ্লোগানে।

স্বর্গচ্যুতির পরে

তুই না ডাকলে এ জনাকীর্ণ
নকল স্বর্গে আসতো কে ?
ঘৃণা করি তোকে যেমন জীর্ণ
অসুস্থ লোক স্বাস্থ্যকে।

রূপ দেখি তোর যেমন দীপ্ত
চাঁদকে গলির খঞ্জটা।
ঈর্ষায় জ্বলি, চির অতৃপ্ত
চক্ষে ঘৃণার ঘনঘটা।

তোর বিচ্ছেদে আত্মহত্যা
করবো ভেবেই সুখ পেলি।
কিন্তু এখনো আমার সত্তা
লুটছে দিনের লাল চেলি !

চিন্তার জ্ঞানী জটিল সর্প
আমাকে ফেরায় বাস্তবে।
এত যদি তোর সাধের দর্প,
চুম্বন কেন চাস তবে?

মরবো হারিয়ে নকল স্বর্গ,
জানি ছিল তোর বিশ্বাস।
ঝলুক নরকে ত্রাসের খড়্গ,
সেখানেই নেব নিশ্বাস।

দাঁত

বয়স আমার চল্লিশ হলো
এবং তোমার থরোথরো ষোলো!
কৃতী নই কোনো, আমি অভাজন;
অনেক আশায় নষ্ট গাঞ্জন।

কলেজের বাস ক'টি বসন্ত
নিয়ে থামলেই মাঝে মাঝে দেখি।
তোমার জুতোর খুরে ওড়ে কাল,
হৃদয় স্মৃতির জ্যোছনায় সেঁকি।

হঠাৎ কখনো তোমার গালের
রক্তাভা দেখে লাগে বড় চেনা—
যেন তা' গ্রীষ্মের সূর্যাস্তের
অতীব বিধুর মেঘেদের ফেনা।

তোমার ও-মুখমন্ডল দেখে
মনে পড়ে আরো দৃশ্য ভিন্ন,

এক লহমায় মনে প'ড়ে যায়
নভোচারীদের পায়ের চিহ্ন।

একদা তোমার বয়স যখন
পাঁচটি চাঁপার মতো অবিকল,
দেখেছি সেদিন তুমি কচি দাঁতে
কামড়ে কামড়ে খেতে ক'তো ফল।

আজো অবশ্য শুভ্র দাঁতের
ধারে ছিঁড়ে নাও ফলের চামড়া
এবং মাংস। শুধু তাই নয়,
আরো কিছু কথা জেনেছি আমরা।

তোমার তীক্ষ্ণ দাঁতের ফলায়
ক্ষতবিক্ষত রক্তগোলাপ;
বাঘিনীর মতো ঠোঁট চাটো আর
দু'পায়ে মাড়াও পাখির বিলাপ।

তোমার দাঁতের শরশয্যায়
বুক পেতে দিয়ে সুখ যারা চায়,
সেই গোষ্ঠীর আমি নই কেউ;
মজ্জা চাটছে বয়সের ফেউ।

দুঃস্বপ্নে একদিন

চাল পাচ্ছি, ডাল পাচ্ছি, তেল নুন লাকড়ি পাচ্ছি,
ভাগ-করা পিঠে পাচ্ছি, মদির রাত্তিরে কাউকে নিয়ে
শোবার ঘর পাচ্ছি, মুখ দেখবার

ঝকঝকে আয়না পচ্ছি, হেঁটে বেড়ানোর
তকতকে হাসপাতালী করিডর পাচ্ছি।
কিউতে দাঁড়িয়ে খাদ্য কিনছি,
বাদ্য শুনছি।

সরকারী বাসে চড়ছি,
দরকারী কাগজ পড়ছি,
কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি,
খাচ্ছি দাচ্ছি, চকচকে ব্লেডে দাড়ি কামাচ্ছি, দু'বেলা
পার্কে যাচ্ছি. মাইক্রোফোনী কথা শুনছি,
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।

আপনারা নতুন পয়োঃপ্রণালী পরিকল্পনা নিয়ে
জল্পনা কল্পনা করছেন,
কারাগার পরিচালনার পদ্ধতি শোধরাবার
কথা ভাবছেন (তখনো থাকবে কারাগারে)
নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে, মাটি কাটছে ট্রাক্টর,
ফ্যাক্টরি ছড়াচ্ছে ধোঁয়া, কাজ হচ্ছে,
কাজ হচ্ছে,
কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি।

মধ্যে মধ্যে আমার মগজের বাগানের সেই পাখি
গান গেয়ে ওঠে, আমার চোখের সামনে
হঠাৎ কোনো রুপালি শহরের উদ্ভাসন।
দোহাই আপনাদের, সেই পাখির
টুঁটি চেপে ধরবেন না, হত্যা করবেন না বেচারীকে।

কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি,
খাচ্ছি দাচ্ছি, চকচকে ব্লেডে দাড়ি কামাচ্ছি, দু'বেলা

পার্কে যাচ্ছি, মাইক্রোফোনী কথা শুনছি,
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।

আকাশের পেটে বোমা মারলেও

আকাশের পেটে বোমা মারলেও ছাই এক কাচ্চা
বিদ্যে-বুদ্ধি বেরুবে না, ঠিকরে পড়বে না পরামর্শ।
অথচ সুদূর
আকাশেরই দিকে ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে থাকি বারবার।

পা-পোষে পাম্পসু ঘ'ষে ঘ'ষে কতোদিন গেলো, তবু
পদোন্নতি মাঠে মারা যাচ্ছে,
দপ্তরের খিটখিটে কিন্তু ফিটফাট বড় কর্তা
কেবলি ধমকাচ্ছেন হপ্তায় হপ্তায়।
যিনি হ'লে হ'তে পারতেন আমার শ্বশুর, তিনি তাঁর
আত্মজাকে পশুর মতোই
অন্যত্র চালান দিতে করেন নি কসুর, হায় রে,
আমি শুধু আকাশের দিকে চেয়ে থাকি ফ্যাল ফ্যাল।

বোনগুলো আইবুড়ো থেকে যাচ্ছে ক্রমাগত আর
অনুজ ক'মাস ধ'রে ছেঁড়া প্যান্ট প'রে যাচ্ছে স্কুলে।
উপরন্তু বিমুখ পাড়ার মুদি; বাবার বাতের
মালিশ কেনার পয়সাও নেই হাতে।
হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে দ্রুত জননী হচ্ছেন ফোঁত আর
আমি শুধু আকাশের দিকে ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে থাকি।

শান্তির দোহাই পেড়ে সবাই মটকে দিচ্ছে পায়রার ঘাড়
এবং প্রগতিশীল নাটকের কুশী—

লবের কমতি নেই, পার্ট জানা থাক
অথবা না থাক সমস্বরে চেঁচালেই কেল্লা ফতে।

অপরের পাকা ঘুঁটি কাচিয়ে নিজের ঘুঁটি ঘরে
তুলছে অনেকে,
একজন দিন দুপুরেই স্রেফ ছুরির ফলায়
নিপুণ ফাঁসিয়ে দিচ্ছে অন্যের উদর,
আমি শুধু আকাশের দিকে চেয়ে থাকি ফ্যাল ফ্যাল—
অথচ সুদূর
আকাশের পেটে বোমা মারলেও ছাই।

আমি কথা বলাতে চাই

আমি কথা বলাতে চাই,
কথা বলাতে চাই আমার ঘরের আসবাবপত্রকে,
ছাদের কার্ণিশ আর জানলাকে, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে যে-গাছ,
গাছের ডালে লাফাচ্ছে যে-কাঠবিড়ালী,
আর আস্তাবলে ঝিমোচ্ছে বুড়োটে যে-ঘোড়া,
তাদের আমি কথা বলাতে চাই।

গাছের যত পাতা, আকাশের যত নক্ষত্র,
নদীর ঢেউ, হাওয়ার প্রতিটি ঝলক,
প্রতিটি ফুল, শিশিরের প্রতিটি বিন্দু,
আমার চোখের মণি, আমার হাত-গাছ,
ওদের সবাইকে আমি কথা বলাতে চাই।

কী ওরা বলবে, এক্ষুনি বলা মুশকিল।
সবাই কি বলবে একই কথা
ঘুরে ফিরে ? না কি প্রত্যেকেই বলবে নিজস্ব কথা
অন্যান্য উচ্চারণে !
ওরা কি শোনাবে কোনো তত্ত্বকথা ?

বলবে কি হাইড্রোজেন বোমার জন্মকাহিনী ?
বলবে কি হিরোশিমা ভয়াবহভাবে
পঙ্গু হওয়ার পর
কী ক'রে আধুনিক চৈতন্যে জমলো দুঃস্বপ্নের ভিড় ?
ওরা কি দেবে স্বৈরতন্ত্রী মিথ্যার একনিষ্ঠ বিবরণ ?

ওরা বলুক যে যার কথা, যেমন ইচ্ছা বলুক।
সত্যাগ্রহের আগেই
ওদের সবাইকে আমি বাক-স্বাধীনতা দিতে চাই।